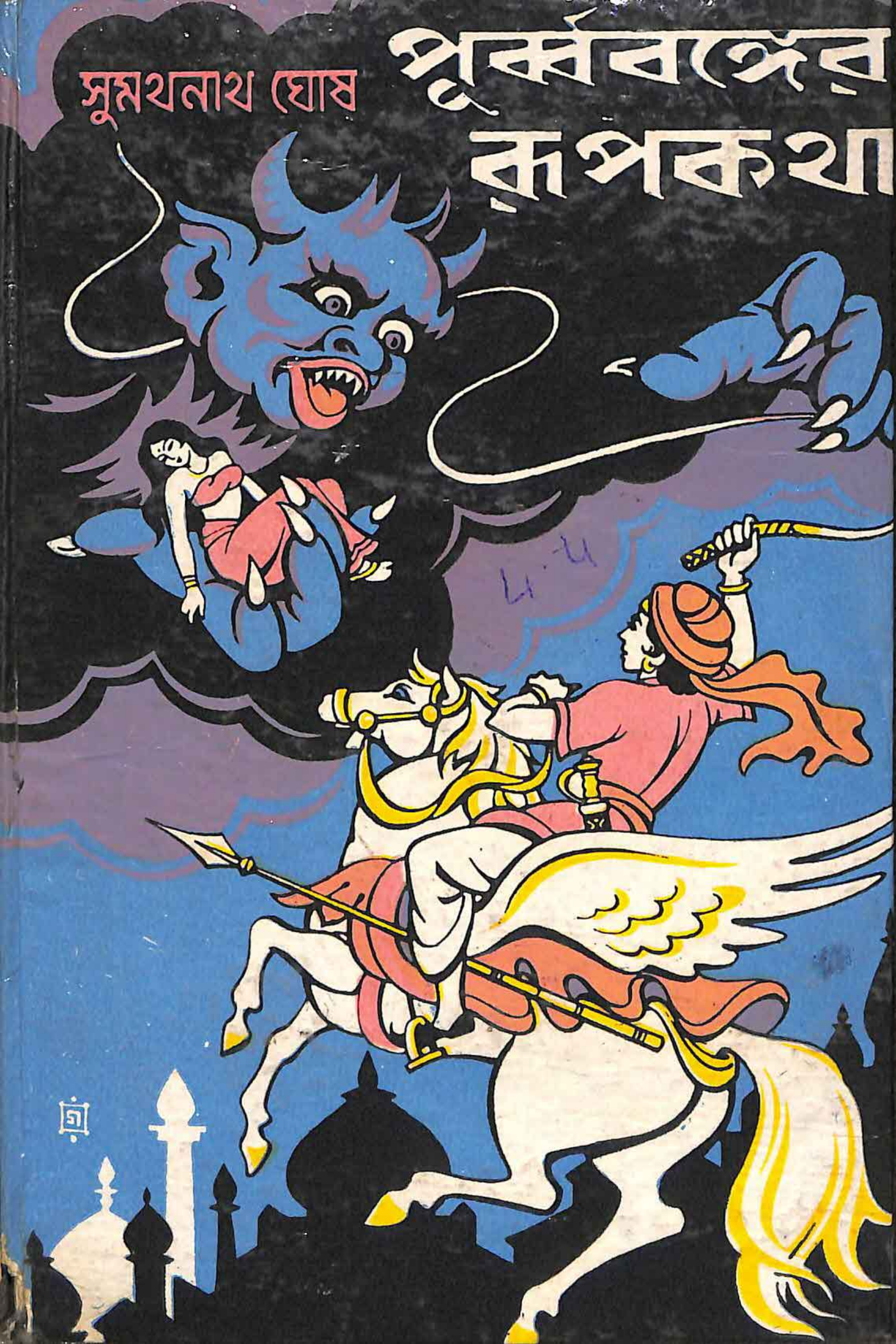

সুমথনাথ ঘোষ
পূর্ব্ববঙ্গের
রূপকথা

পূর্ববঙ্গের রূপকথা

সুমথনাথ ঘোষ

বি ম লা র ঞ্জ ন প্র কা শ ন
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

শুভ রথযাত্রা—১৩৯২

২০শে জুন ১৯৮৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :—

গণেশ বসু

মূল্য সাত টাকা মাত্র

শ্রীবিমলারঞ্জনচন্দ্র কর্তৃক বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুগলকিশোর রায়, কর্তৃক শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস, ৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

॥ ভূমিকা ॥

সুমথনাথ ঘোষ বলতে গেলে তাঁর কিশোর বয়স থেকেই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে গল্প লিখছেন। বড়দের গল্প-লেখক উপন্যাসিক বলেই তিনি বিখ্যাত—কিন্তু তাঁর ছোটদের বইয়ের চাহিদা অনেক বেশী। তাঁর কোন কোন ছোটদের বই হাজারে হাজারে বিক্রী হয়েছে। 'ছোটদের বিশ্বসাহিত্য' 'মহাপুরুষদের বাল্যকাল' 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' 'বাংলার টার্জান' এবং অনেক বিখ্যাত ইংরেজী বইয়ের সারানুবাদ একসময় তাঁকে বাংলা শিশু-সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে স্থান করে দিয়েছিল। এখনও তাঁর 'কিশোর গ্রন্থা-বলী'র অসামান্য চাহিদা।

এই ছোট্ট বইটি নানা কারণে বহুকাল ছাপা ছিল না। তাতে ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী ছোট ছেলেমেয়েদেরই।

'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ, তা:আজকাল বিশেষ কেউ পড়ে না। অথচ রূপকথা হিসেবে তার তুলনা নেই। এ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের ঠাকুমা দিদিমারা মুখে মুখে নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাতেন, বলার সময় যিনি বলছেন তার বলার গুণে—নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে কিছু রদবদল করতেন—একই কাহিনী নানাভাবে নানা জায়গায় শোনা বা পড়া যায়। যেমন এই বইয়ের কাঞ্চনমালা গল্প, দক্ষিণা-রঞ্জনের ঠাকুরদার ঝুলি বইতে অনেক বদলে গেছে।

সুমথবাবু এমনি কটি রূপকথা-উপকথায় মিশানো গল্প তাঁর কলমের জাদুতে আমাদের ছেলেমেয়েদের তো বটেই, আমাদের কাছেও লোভনীয় করে তুলেছেন। আমিই তো এই সেদিন এক নিঃশ্বাসে পড়েছি সবকটি গল্প। আশাকরছি এখনকার ছেলেমেয়েরা এই বই পড়তে পড়তে এক স্বপ্ন কল্পনার দেশে চলে যাবে—যে সুখটুকু এখন তারা ভারী ভারী পাঠ্য বইয়ের চাপে একেবারেই পায় না।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রকাশকের নিবেদন

সুমথবাবুর এই বইটি নানা অসুবিধার জন্য প্রকাশে খুব দেরি হয়ে গেল, সেজন্য আমরা দুঃখিত। বহু ছেলেমেয়ে ও তাদের অভিভাবকরা বার বার খোঁজ করে গেছেন, আশা করছি এবার তাঁদের ক্ষোভ দূর হবে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো বইটিকে ছোটদের মনের মতো করে সাজাবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু এখন ছাপাখানা ও কাগজের যা অবস্থা ইচ্ছা মতো কিছু করা যায় না। তবে আশা করছি আমাদের ছোট ছোট ভাইবোনেরা সাজ-সজ্জার চাইতে এইসব চমৎকার গল্পেই ডুবে যাবেন, ছবি মলাট নিয়ে অত মাথা ঘামাবেন না।

ইতি

প্রকাশক

মহুয়া

মায়ের মত আমাদের জন্মভূমি এ আমাদের পূণ্যভূমি স্বর্গের মত। এই আমাদের বাংলাদেশ সব চেয়ে সুন্দর। পূর্ব অংশের নাম পূর্ববঙ্গ। সোনার বাংলাভূমি। আসাম প্রদেশ, তার পূর্ব দিকে, আবার তার পূর্ব অঞ্চলে যে এক পাহাড়, তাকে বলে গারো পাহাড়। একই আকাশ একই নদী-নালা, একই বাতাস, গোটা বাংলা পুব ও পশ্চিম ভাগাভাগি হলেও আমরা এক। আমাদের একই মায়ের ডান হাত, বাঁ-হাতের মত একই বাংলার এই দুই দিক, দুই অংশ অভিন্ন, অচ্ছেদ্য। নদ নদী এক, জল বাতাস ফল ফুল এক আর অচ্ছেদ্য। একভাষা, আমরা মুখে যে ভাষায় মা বলে ডাকি, ওরা বলে সে ভাষা, ওরাও আমাদের মতই ডাকে সেই মা বলে।

ছ'মাসের হাঁটাপথ গারো পাহাড়। সেখান থেকে অনেক দূরে আরো আরো উত্তরে গেলে হিমালয়। আবার তারো উত্তরে বহু দূরে এক বন—যেমন নিবিড় তেমনি দুর্ভেদ্য। দিনে সূর্যের আলো সেখানে ঢোকে না, রাত্রে তারা দেখা যায় না। সেইখানে, সেই জঙ্গলের মধ্যে বাস কর্‌তো এক বেদে—নাম তার হুম্‌ড়ো সর্দার। দিনের বেলায় সে তার দলবল নিয়ে ভানুমতীর খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। আর রাত্রে চুপিচুপি করতো ডাকাতি—সে আর তার ভাই মানিক।

একদিন তারা দুই ভাই ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছলো এক গ্রামে।

সমস্ত দিন তাদের খাওয়া হয়নি! ক্ষিদেয় তেষ্টায় কাতর হ'য়ে খুঁজে খুঁজে তারা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে উঠলো।

ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র কিন্তু অতিথি নারায়ণ! তাই ঘরে যা খুদকুঁড়ো ছিল নিজে না খেয়ে তাদের খেতে দিলেন আর রাত্রে তাদেরও তো প্রাণের ভয় আছে, পাছে ধরা পড়ে বা অন্য কেউ দেখে ফেলে তাই অন্ধকার গভীর রাত্রে শোবার জন্য তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা

শুয়ে রইলেন বাইরের দাওয়ায়!

ব্রাহ্মণের কোলের কাছে তাঁর একমাত্র শিশুকন্যা নির্ভয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল; ছ'মাসের শিশু যেন ফুটন্ত গোলাপ!

মেয়েটির রূপ দেখে ডাকাতদের এমন লোভ হ'লো যে গভীর রাত্রে ব্রাহ্মণ যখন ঘুমে অচেতন তারা দুই ভাই চুপিচুপি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল একেবারে সেই দেশ ছেড়ে। সারা রাত ধরে বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা শুধু ছুটেছে।

সকালে উঠে ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখতে না পেয়ে কেঁদেকেটে অস্থির হ'লেন এবং পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন চারদিকে। কিন্তু হায়, তারা তখন চলে গেছে তাঁর একেবারে নাগালের বাইরে!

হুম্‌ড়ো আর মানিক কোথাও না থেমে একেবারে সোজা গিয়ে ঢুক্‌লো তাদের বাসায়—সেই জঙ্গলের মধ্যে। আর পাখীকে যেমন ক'রে খাঁচায় পুরে রাখে তেমনি ক'রে মানুষ করতে লাগল সেই মেয়েটিকে।

তাদের সেবায় যত্নে মেয়েটি বড় হ'তে লাগল। ছ'মাস থেকে এক বছর—এক বছর থেকে দু'বছর—দু'বছর থেকে দশ বছর—এমনি ক'রে একদিন সে ষোল বছরে পা দিলে, তখন হুম্‌ড়ো সর্দার তাকে নানারকম খেলা শেখালে, ভানুমতির খেলা, ভোজবাজী, কত বাঁশবাজী, পাখী বাঁদরের কত খেলা আর তারপর থেকে নিজের দলের সঙ্গে তাকে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি তখন দেখতে এত সুন্দর হয়েছে যে রূপ যেন তার চোখে মুখে ধরে না। রূপ যে দেখে সেই চেয়ে থাকে তার পানে।

চাঁদের মত মুখ, পদ্মফুলের পাপড়ির মত চোখ, কালো-কোঁকড়া মেঘের মত পিঠ-ভরা কোঁকড়া চুল, আর তেমনি কণ্ঠস্বর এত মিষ্টি যে কথা কইলে মনে হয় যেন মৌমাছি গুন্‌গুন্ করছে। বেদের ঘরের ঘরে এমন সোনার চাঁদ মেয়ে কোথা থেকে এলো, সবাই আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবে!

অনেক ভেবেচিন্তে হুম্‌ড়ো তার নাম রাখলে মহুয়াসুন্দরী। অন্ধকারে যেন মানিকের মত জ্বলে তার রূপ!

কিছুদিন ধরে এগাঁ ওগাঁ করে নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে আসে। এর পর বাড়িতে আরো কিছুদিন বসে থাক্‌বার পর হঠাৎ একদিন হুম্‌ড়ো তার ভাইকে ডেকে বল্‌লে, "মান্‌কে, চল্‌ আমরা এবার খেলা দেখাতে বিদেশ যাই।"

মানিক বল্‌লে, "হ্যাঁ তাই চলো, অনেক দিন বিদেশ যাওয়া হয়নি। এবার গেলে নিশ্চয় অনেক বেশী রোজগারপাতি হবে।

পরদিন ভোরে উঠেই তারা রওনা হ'লো বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে। অনেক দূরে বিদেশযাত্রা। তার অনেক আয়োজন। অনেক গোছ-গাছ অনেক সাবধান অনেক সর্তকতা!

আগে চল্‌লো হুম্‌ড়ো সর্দ্দার' তার পেছনে মহুয়াসুন্দরী, তার পেছনে মানিক ভাই আর তার পেছনে দলে দলে সব লোকজন! কারুর কাছে তাঁবু, কারুর কাছে বাঁশ, কারুর কাছে দড়িদড়া; কেউ নিলে তোতাপাখী, কেউ নিলে ময়না, কেউ নিলে সোনামুখী দোয়েল, কেউ নিলে গাধা-ঘোড়া, আবার কেউ বা নিলে চণ্ডালের হাড়! এই-ভাবে তারা এক-একজন এক-একটা পোঁটলা-পুঁট্‌লি মাথায় নিয়ে সারি দিয়ে চলতে থাকে। মস্ত গ্রাম। অনেক ঘরবাড়ী হাঁটছে তো হাঁটছে, অনেক লোকজন। পথ যেন ফুরোয় না। অনেকদিন কেটে গেল। একদিন, দুদিন করতে করতে।

কত মাঠঘাট, কত নদনদী, কত অরণ্যপ্রান্তর পেরিয়ে শেষে তারা গিয়ে হাজির হ'লো এক গ্রামে। তার নাম বামুনকাঁদা।

সেখানকার জমিদার নদেরচাঁদ ঠাকুর। তিনি তখন তাঁর পাত্রমিত্র নিয়ে সভায় আলোচনায় বসেছিলেন। একজন লোক ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে খবর দিলে, একদল বেদে খেলা দেখাবার জন্য গ্রামে এসেছে। তাদের মস্তভারী দল। তাদের অনেক লোক, অনেক জন্তু-জানোয়ার, তাঁবু সারি সারি পড়ছে মাঠের শেষে বড় দীঘির পাড়ে

নদেরচাঁদের বয়স খুব বেশী নয়—উনিশ কি কুড়ি। বেদের খেলা দেখতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাই তৎক্ষণাৎ সভা ছেড়ে ভিতরে অন্তঃপুরে গেলেন মায়ের কাছে অনুমতি নিতে।

ছেলের এই আব্দার মা ঠেলতে পার্‌লেন না। বল্‌লেন, "কত টাকা লাগবে?"

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "আমি আগেই লোক পাঠিয়ে সে খবর এনেছি মা। মোট একশো টাকা।"

মা বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাদের খবর দাও—তারা আমাদের বাড়ীর ভিতরে এসে খেলা দেখাক্।"

হুম্‌ড়োর কাছে খবর গেল। সে তখনি তার দলবল নিয়ে জমিদার বাড়ীতে এসে হাজির হ'লো এবং ঢোল বাজিয়ে, কাঁসি বাজিয়ে খেলা শুরু ক'রে দিল—আরে, লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেল্কীর খেলা লাগ্!

ঢোলের শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটোছুটি কর্‌তে লাগল। এ ডাকে ওকে—ও ডাকে তাকে। এইভাবে একজনের মুখ থেকে আর একজন, আবার তার মুখ থেকে অন্য জন এই রকম ক'রে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে। দেখতে দেখতে রীতিমত একটা ভীড় জমে গেল জমিদার-বাড়ীতে।

প্রথমেই উঠলো দলের সর্দ্দার হুম্‌ড়ো সর্দ্দার খেলা দেখাতে। তারপর মানিকভাই, তারপর অন্যান্য খেলোয়াড়রা একের পর এক। ঘোড়া, কুকুর, ময়না, তোতাপাখী প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কত রকমের খেলা তারা দেখালে। সবাই অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগল তাদের কসরৎ।

এমন সময় উঠলো বেদের মেয়ে মহুয়াসুন্দরী!

নদেরচাঁদ বসেছিলেন, এবার আসন ছেড়ে একেবারে সে ভয়ে উঠে দাঁড়ালেন তাকে দেখে। তারপর যেই সে দড়ি বেয়ে একটা বাঁশের ওপরে উঠলো খেলা দেখাতে, নদেরচাঁদ এমনি চেঁচিয়ে ওঠে, "দেখো, দেখো, সে ভয়ে যেন পড়ে যায় না।" ভয়ে তাঁর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল!

করতালের রুনুঝুনু, ঢোলকাঁসির মৃদুমন্দ গুরুগম্ভীর বাদ্যের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে মহুয়া গান গাইতে লাগল এবং শেষে হাত পেতে সবার কাছে বক্‌শিস্ চাইতে চাইতে হঠাৎ নদেরচাঁদের সাম্‌নে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো! তারপর ঈষৎ হেসে গানের সুরে তার সুন্দর হাতটা মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বক্‌শিস্ চাইলে তাঁর কাছে।

হাজার টাকা মূল্যের শাল ছিল নদেরচাঁদের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানা গা থেকে খুলে মহুয়াসুন্দরীর হাতে দিয়ে দিলেন।
নাচতে নাচতে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মহুয়া সুন্দরী তাঁকে সেলাম দিয়ে চলে গেল।

তখন সর্দার উঠে নদেরচাঁদ ঠাকুরের কাছে গিয়ে দুহাত জোড় করে তার সঙ্গে বাস করবার জন্য একখানা নতুন বাড়ী বক্‌শিস্ চাইলে। বললে, আপনি কতবড় জমিদার রাজাবাবু গরীবদুঃখীর মাবাপ!

নদেরচাঁদ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ একখানা বাড়ী ও অনেক জমিজমা তাকে দান করে দিলেন।

এত বক্‌শিস্ পেয়ে তাদের আর আনন্দ ধরে না। তারা শতমুখে নদেরচাঁদ ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই নতুন বাড়ীতে গিয়ে ঢুক্‌লো এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস কর্‌তে লাগলো।

কিন্তু মুশকিল হ'লো মহুয়াকে নিয়ে। নতুন ঘর, নতুন বাড়ী, নতুন ক্ষেতখামার পেয়েও তার মনে সুখ নেই। যত দিন যায় সে মুখ গোমড়া করে থাকে। ভাল করে খায় না। বেশী কথা কয় না। তার মুখেও কেউ হাসি দেখতে পায় না। কি হ'লো কে জানে! দিনরাত সে চুপ করে বসে থাকে, চিন্তা করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আবার কাঁদে যখন তখন।

হুম্‌ড়ো সর্দার তাকে কত বোঝায়, কত কি দেবো বলে তার মন ভোলাবার চেষ্টা করে কিন্তু তবু কিছুতেই তার মুখে হাসি দেখতে পায় না তার চোখের জল থামে না।

তখন হুম্‌ড়ো একটা মতলব ঠাওরালে। সেই গ্রামে মহুয়া একটি মেয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছিল দুজনের মধ্যে খুব ভাব সে জানতো

তাই একদিন—তাকে ডেকে চুপিচুপি সে বল্‌লে, মহুয়ার মনে কি হয়েছে সঠিক তোমায় বলে দিতে হবে। তাহলে তোমায় বকশিস দেবো।

মেয়েরা মেয়েদের মনের কথা সহজেই বুঝতে পারে। তাই দু'দিন পরে সে হুম্‌ড়োকে গিয়ে খবর দিলে, মহুয়া নদেরচাঁদকে বিয়ে করতে চায়—তাই এত কাঁদে।

এই কথা শুনে হুম্‌ড়ো সর্দারের মুখ শুকিয়ে গেল। নদেরচাঁদ ঠাকুর প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তাঁর অর্থবল আছে—লোকজনের অস্ত্র শস্ত্রের অভাব নেই—মনে কর্‌লেই এখনি মহুয়াকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারে।

হুম্‌ড়ো রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। ভায়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে স্থির করলে সেখানে থাকা আর একদিনও উচিত নয়। এই মনে করে, সেইদিন-ই গভীর রাত্রে লোকজন সব নিয়ে চুপিচুপি তল্পীতল্পা গুটিয়ে তারা সেই গ্রাম ছেড়ে পালালো।

জমিজায়গা, ক্ষেতখামার, বাড়ীঘর—সব যেখানকার যা পড়ে রইল—একবারও তাদের দিকে ফিরে চাইলে না। শুধু ছুট-ছুট আর ছুট। প্রাণপণে সবাই ছুটছে।

এদিকে সকাল হ'তেই লোকজনেরা গিয়ে নদেরচাঁদ ঠাকুরকে খবর দিলে যে হুম্‌ড়ো তার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বাড়ীর দরজা খোলা—খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কোন মানুষজনের চিহ্ন নেই।

প্রথমে চিন্তা তারপর রাগ হলো নদের চাঁদের মনে! কেন তারা চুপিচুপি এইভাবে পালালো! কেনই বা তাঁকে কিছু না ব'লে গেল! তিনি তো তাদের বাড়ীঘর দিয়েছেন, জমিজমা দিয়েছেন কোন অভাব তো তাদের রাখেননি তবে কেন তার সঙ্গে এই ভাবে লুকোচুরি খেলা? নদেরচাঁদ কিছুই ভেবে পান না। তখন তিনি দু'চারজন চর লাগিয়ে দিলেন তাদের পালিয়ে যাবার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্য।

গুপ্তচরেরা তখনি এদিক ওদিকে ছুটলো। কিন্তু কোথাও কিছু

সংবাদ জানতে পারল না। একজন জানতো মহুয়ার সইকে। তখন চরেরা মহুয়ার সইয়ের কাছ থেকে সব কথা বের ক'রে নিল। তারা এসে নদেরচাঁদকে বল্‌লে, "মহারাজ, পাছে আপনি মহুয়াসুন্দীকে বিয়ে করেন, এই ভয়ে হুম্‌ড়ো সর্দার আপনাকে না-ব'লে পালিয়েছে— মহুয়া নাকি আপনাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য খেতোনা ঘুমতোনা কান্না-কাটি শুরু করেছিল।"

রাগে নদেরচাঁদের চোখ দুটো দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। তিনি ভাবলেন, এতবড় স্পর্দ্ধা হুম্‌ড়ো সর্দারের যে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ব'লে মেয়েটাকে নিয়ে পালাল! কেন, আমি কি তার জামাই হবার যোগ্য নই? জমিদার নদেরচাঁদ কি একটা বেদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না? এতবড় অপমান আমার! আচ্ছা, দেখে নেবো সে কেমন ক'রে আমায় বাধা দেয়! এই ব'লে পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই নদেরচাঁদ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মহুয়া-সুন্দরীর সন্ধানে। লোকজন, সিপাই, বরকন্দাজ-অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে একাই, ছদ্মবেশে এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ করে' তিনি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজতে লাগলেন। কখনো উত্তরে যান, কখনো যান পশ্চিমে, আবার কখনো বা ঢুঁড়ে ফেলেন সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল। কিন্তু—কোথাও তিনি তাদের সন্ধান কর্‌তে পারেন না।

পথেঘাটে যাদের সঙ্গে দেখা হয় জনেজনে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কেউ হুম্‌ড়ো সর্দারকে দেখেছো? তারা বল্‌তে পারে না। তখন তাদের দলের সেই মেয়েটা মহুয়াকে কেমন দেখতে, হুম্‌ড়ো সদ্দারকে ছোরা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন—কেমন বর্ণনা, কিন্তু তবুও কোন ফল হয় না। হয়রান হ'য়ে তিনি ঘুরে বেড়ান পথে পথে দেশ-বিদেশে।

এইভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন নদেরচাঁদ তাদের সন্ধান পেলেন এবং চুপি চুপি গিয়ে হাজির হ'লেন একেবারে মহুয়াদের বাড়ী।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ীতে হুম্‌ড়ো সর্দার ছিল না।

নদেরচাঁদকে দেখেই মহুয়া চিন্‌তে পারলে। কিন্তু অন্যের কাছে তাঁর পরিচয় গোপন ক'রে বল্‌লে, এক নতুন অতিথি।

তখনই অতিথি-সৎকারের ধুম পড়ে গেল।

মহুয়াসুন্দরী রান্নাবান্নার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পাক ক'রে একেবারে ঘর ভরিয়ে ফেললে। এতবড় জমিদার তাঁকে তো যা তা খেতে দেওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার বাসায় ফিরে এলো। কিন্তু মহুয়ার কাজে আজ হঠাৎ এত উৎসাহ দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো। ছ'মাস ধরে যে-মেয়ে অন্যমনস্ক ও মন-মরা হ'য়েছিল তার মনে অকস্মাৎ আজ এ প্রেরণা কোথা থেকে এলো! এই কথা মনে মনে চিন্তা কর্‌তে-কর্‌তে হুম্‌ড়ো দেখতে গেল সেই নতুন অতিথিটিকে। কিন্তু একি—এ যে জমিদার নাদেরচাঁদ ঠাকুর! তাঁকে দেখেই হুম্‌ড়ো শিউরে উঠলেন।

কিন্তু মুখে কোন কথা না ব'লে সেও সাদরে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন। যদিও ছদ্মবেশে তবুও চিনতে বিলম্ব হল না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই নদেরচাঁদ চলে গেলেন। যখন সন্ধান মিলেছে আর চিন্তা নাই। এবার লোকজন নিয়ে এসে ধরে নিয়ে যাবেন মহুয়াকে এই মনে করে খানিক দূরে গিয়ে নদীর ধারে একটা গাছের তলায় বসে অপেক্ষা করতে থাকেন নৌকোর জন্যে। কিন্তু নৌকোর কোন দেখা নেই। বসে বসে রাত হয়ে যায়। তখন সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন।

দুশ্চিন্তায় আবার হুম্‌ড়োর মুখ শুকিয়ে গেল। যার ভয়ে বিষয় সম্পত্তি জমিজমা সব ছেড়ে দিয়ে এখানে এই-দূর দেশে পালিয়ে এসেছে সেই আপদ আবার কোথা থেকে এসে জুটলো! কি করে এর হাত থেকে এখন রেহাই পাবে, সেই চিন্তা করতে থাকে।

গভীর রাত। সবাই তখন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময় একখানা ধারালো ছোরা হাতে ক'রে পা টিপে টিপে হুম্‌ড়ো সর্দার

মহুয়ার ঘরে ঢুক্‌লো। তারপর চাপা-গলায় তাকে ডাকলে।

হঠাৎ চোখ খুলেই মহুয়া দেখলে তার সামনে একখানা ছোরা চক্‌চক্ কর্‌ছে।

ভয়ে তার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ কর্‌তে লাগলো। কোন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কর্‌বার আগেই হুম্‌ড়ো তার হাতে সেই ছোরাখানা দিয়ে বল্‌লে "নদীর ধারে বড় ঝাউগাছটার তলায় একটা লোক ঘুমুচ্ছে—এখুনি গিয়ে তাকে হত্যা কর্‌তে হবে। লোকটা ভারি শয়তান—যাহুমন্ত্রে সে আমাদের সকলকে বশ কর্‌তে চায়।

ছোরাখানা হাতে নিয়ে কম্পিতবক্ষে মহুয়া নদীর ধারে সেই ঝাউ-তলায় গেল। তারপর সেই নিদ্রিত লোকটির বুকে ছোরা বসাতে গিয়ে চম্‌কে উঠলো সে।

হ্যাঁ এ-যে নদেরচাঁদ! না, না। কি ক'রে তার বুকে ছুরি মার্‌বে! এই ভেবে মহুয়া সেখানে বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগলো।

তার কান্নার শব্দ পেয়ে নদেরচাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, "তুমি কাঁদছ কেন—আর তোমার হাতে ছোরা কেন?"

মহুয়া তখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশের কথা গোপন না করে সব তাঁকে বল্‌লে।

সেই কথা শুনে নদেরচাঁদ একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "তার জন্যে এত কান্নার কি আছে! আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তুমি আমায় হত্যা ক'রে তোমার পিতার আদেশ পালন কর।" তোমার চোখে জল দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

মহুয়া বল্‌লে, "তা আমি কিছুতেই পার্‌বো না। তার চেয়ে ছোরাখানা তুমি আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে আমায় এই পাপ কর্ম থেকে মুক্তি দাও।"

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, তা হয় না! "অসম্ভব।"

ছু'জনের কেউ-ই যখন সে কাজ করতে রাজী হ'লো না, তখন নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "তার চেয়ে একটা কাজ কর্‌লে এখুনি হয়ত সব

সমস্যার সমাধান হয়।”

মহুয়া সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে “কি কাজ?”

নদেরচাঁদ চুপিচুপি বল্‌লেন, “চলো আমরা এখান থেকে কোথাও পালিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে তোমায় বিয়ে ক’রে আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার কর্‌বো।”

বিয়ের কথা শুনে মহুয়ার মনে সাহস বেড়ে যায়। তবু একটু ভেবে সে বল্‌লো—“কিন্তু হুম্‌ড়ো সর্দ্দার একথা জান্‌তে পার্‌লে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না।”

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, “সর্দ্দার জান্‌তে পার্‌বার আগেই আমরা এদেশ ছেড়ে অন্যদেশে পালিয়ে যাবো।”

মহুয়া রাজী হ’লো।

তখন দু’জনে সেই অন্ধকারে মাঠ, ঘাট, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুট্‌তে লাগলো প্রাণপণে।

ভোর হবার আগেই তারা এসে পৌঁছল একটা নদীর ধারে। কিন্তু কি ক’রে পার হবে! তারা তখন পড়লো মহা দুশ্চিন্তায়। এযে বিরাট নদী!

এমন সময় তারা দেখলে দূরে একটা নৌকোর আলো দেখা যাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করবার পর নৌকোটি পাড়ে এসে ভিড়লো এবং তাদের পার ক’রে দিতে রাজী হ’লো।

নৌকোটি এক মহাজনের। সে লোকজন নিয়ে দূরে কোন হাটে মাল কিন্‌তে যাচ্ছিল। তাই নিঃসন্দেহে তারা তাতে উঠে পড়লো।

কিন্তু ভারি বিপদ হ’লো! নৌকো যেই মাঝনদীতে গিয়েছে অমনি কয়েকজন ষণ্ডাগুণ্ডা লোক এসে নদেরচাঁদকে ঘিরে দাঁড়ালো এবং দড়ি দিয়ে হাত-পা বেশ—ক’রে বেঁধে তাকে নদীর জলে ফেলে দিলে।

মহুয়া চীৎকার ক’রে কেঁদে উঠলো। রক্ষা করো, বাঁচাও, কিন্তু কে তার কান্না শোনে?

সেই নৌকোর মহাজনটি তখন মহুয়াকে গিয়ে বললে, “আমি

তোমায় বিয়ে করবো ব'লে দেশে নিয়ে যাচ্ছি—তোমার কোন আপত্তি আছে ?"

মহুয়া তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, সেই দলের সর্দার এবং তার কাছে কান্নাকাটি করা বৃথা। তাই সে ঘাড় নেড়ে জানালে "না, কোন আপত্তি নেই।" কিন্তু মনে মনে সে চিন্তা করতে লাগলে কেমন ক'রে সে এই দুবৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এদিকে মহুয়ার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে মহাজনটির মনে আর স্ফূর্তি ধরে না।

মহুয়াকে গিয়ে সে বলে, "আজ ভারী আনন্দের দিন—তুমি নিজ হাতে পান সেজে আমাদের সকলকে খাওয়াও।"

পানের কথা বল্‌তেই চট্ ক'রে মহুয়ার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। তার চুলের মধ্যে তক্ষকের বিষ লুকানো ছিল। সে করলে কি চূনের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পান সাজলে এবং তাদের প্রত্যেককে নিজে হাতে ক'রে এক-একটা খেতে দিলে!

মাঝিমাল্লা, লোকজন নৌকোয় যে যেখানে ছিল সবাই সেই পান খেয়ে ঢলে পড়তে লাগল এবং দেখতে দেখতে মুখ দিয়ে গেঁজো উঠে সবাই মরে গেল।

তখন মহুয়া সেই মৃতদেহগুলোকে একে একে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজে নৌকো বাইতে বাইতে পারে গিয়ে হাজির হ'লো।

ওপরে উঠে মহুয়া দেখলে চারিদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কোথাও কোন পথঘাট বা লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তখন সে একাকিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি কোথাও কোন আশ্রয় মেলে এই আশায়!

ক্ষিদেয় তেষ্টায় ক্রমশ তার দেহ অবশ হ'য়ে আসে পা যেন আর চলে না। কোন্ দিকে যাবে ? যেদিকে যায়—সেদিকেই ঘন দুর্ভেদ্য বন! একটু একটু করে সে যে গভীর থেকে আরো গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ছে বুঝতে পারে না।

এইভাবে সমস্ত দিনটা তবু যাহোক ক'রে কাট্‌লো। কিন্তু সূর্য

অস্ত যেতেই মহুয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠলো। এখুনি অন্ধকার এসে সমস্ত বনভূমি আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌বে—তখন সে কি করবে। অন্ধকারে তখন কিছুই দেখা যাবে না। তাছাড়া বন্য জন্তু-জানোয়াররা তখন বেরুবে।

যে কোন উপায়ে হোক একটা আশ্রয়ের জন্য তখন মহুয়ার মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠে।

কিন্তু কোথায় আশ্রয়? পাগলের মত ছুটতে গিয়ে সে আরো গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে। অরণ্যের বুকে, বৃক্ষলতার ফাঁকে ফাঁকে শুধু কালো কালো চাপ চাপ অন্ধকার কোথা থেকে এসে জমতে থাকে বুঝতে পারে না।

যে দিকে চায় কেবল অন্ধকার ঘন কালো আলকাতরার মত। মহুয়ার বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌তে থাকে। সে আরো দ্রুত ঢুক্‌তে লাগল অরণ্যের মধ্যে। এমন সময় যেন ভগবান তার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন।

সেই বনের মধ্যে সে একটা ভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেলে।

তাড়াতাড়ি সেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়েই আগে মহুয়া দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। কিন্তু পা ছড়াতেই সে শিউরে উঠলো! কি যেন একটা জিনিস তার পায়ে ঠেক্‌লো! তাড়াতাড়ি উঠে বসে যা দেখলে তাতে তার দেহ হিম হ'য়ে গেল!

পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ এবং সেটা নদেরচাঁদের। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে তখনি সে চিনতে পারলে।

মহুয়া ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো এবং পাগলিনীর মত ধূলোয় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি তার কান্না থেমে যায়। উঠে বসে তখন ভাবতে লাগল কেমন ক'রে সেই মৃতদেহটা এখানে এলো—কে আন্‌লে তাকে? তাহলে নিশ্চয় কোন লোক এখানে আছে।

এই কথা সবে মনে ভাবছে এমন সময় ঠক্ ঠক্ ক'রে দরজায় শব্দ হ'লো।

মহুয়া চম্‌কে উঠলো। আতঙ্কে তার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো! এ কি! যা ভেবেছে তাই হলো!

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে কে তখন বল্‌লে, "দরজা খোল—কোন ভয় নেই।"



কম্পিতপদে ও শঙ্কিতবক্ষে মহুয়া গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক জটাজুটধারী দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসী। তাকে দেখে ভয়ে সে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল—তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

শুধু ঠক্‌ঠক্ করে সারা দেহ তার কাঁপতে লাগল।

"কে তুই ?" সন্ন্যাসী বল্‌লেন।

ছিন্নলতার মত তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মহুয়া কাঁদ্‌তে লাগল এবং একে একে সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌লে।

সন্ন্যাসী তখন বল্‌লেন, "কোন ভয় নেই—তোমার স্বামীকে আমিই জল থেকে তুলে এনে এখানে রেখেছি। সে এখনো মরেনি—অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছে।" আমি নদীতে নাইতে গিয়েছিলুম, ওকে ভেসে যেতে দেখে তুলে এনেছি।

"মরেনি! তবে কি আবার বাঁচতে পারে ?" মহুয়া কাঁদতে কাঁদ্‌তে প্রশ্ন কর্‌লে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "পারে। কিন্তু তাকে বাঁচালে তুমি আমায় কি পুরস্কার দেবে ?"

মহুয়া বল্‌লে, "আমার স্বামী জীবন পেলে আপনি যা চাইবেন —আমার যথাসর্বস্ব আপনাকে দেবো।"

সন্ন্যাসী তখন বন থেকে একটা গাছের পাতা তুলে এনে মহুয়ার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "যাও, নদী থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে এই পাতায় ক'রে জল তুলে নিয়ে এসো।"

মহুয়া তৎক্ষণাৎ পাতায় ক'রে জল নিয়ে এলো। সন্ন্যাসী কি মন্ত্র পড়ে তাকে সেই জলটা নদেরচাঁদের মুখে ঢেলে দিতে বল্‌লেন। মহুয়া তাড়াতাড়ি নদেরচাঁদের মুখটা ফাঁক ক'রে সেই জল ঢেলে দিলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে নদেরচাঁদ চোখ মেলে চাইল।

আনন্দে মহুয়ার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। তখন গভীর শ্রদ্ধাভরে সে সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় আর নদেরচাঁদের মাথায় দিলে।

সন্ন্যাসী কোন কথা না ব'লে সেই অন্ধকারে তৎক্ষণাৎ বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এইভাবে আরো তিন-চার দিন সেখানে কেটে গেল। মহুয়ার সেবায় যত্নে ক্রমশই নদেরচাঁদ সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ অবার একদিন ভোরে সেই সন্ন্যাসী সেখানে এসে হাজির হ'লেন।

দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে মহুয়া ছুটে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করলে। তখন সন্ন্যাসী মহুয়াকে আদেশ করলেন তাঁর সঙ্গে আসতে।

মহুয়া কোন কথা না ব'লে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলো। ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে তারা ঢুকতে লাগলো। শেষে এক জায়গায় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সন্ন্যাসী বললেন, "মনে আছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমি যা চাইবো তাই দেবে।"

—"হ্যাঁ আছে এবং চিরদিন থাকবে। আদেশ করুন প্রভু কি করতে হবে।"

তখন সন্ন্যাসী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।"

তাড়াতাড়ি মহুয়া দুই কানে হাতচাপা দিয়ে বললে, "ছিঃ ছিঃ ও-কথা শুনলে যে পাপ হয়—স্ত্রীলোকের এক স্বামী থাকতে অন্য বিবাহ হয় না। আপনি সন্ন্যাসী সবই তো জানেন। আপনি এ ছাড়া অন্য কিছু আমায় আদেশ করুন।"

রাগে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দৃঢ় অথচ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, "মাত্র দু'দিন সময় দিলুম—এর মধ্যে ভেবে আমার কথার উত্তর দেওয়া চাই। এ ছাড়া অন্য কিছু প্রতিদান আমি তোমার কাছ থেকে চাই না।"

চিন্তিতমুখে মহুয়া ফিরে এলো মন্দিরে। সমস্ত দিন ধ'রে সে ভাবতে লাগল কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় এই সন্ন্যাসীর হাত থেকে।

শেষে তার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। সেইদিন গভীর রাত্রে সে নদেরচাঁদের রুগ্ন দেহটাকে কাঁধে ফেলে চুপিচুপি পালিয়ে গেল সেই বন ছেড়ে।

দু'পা করে যায়, আবার পিছন ফিরে তাকায়—এইভাবে মহুয়া চল্‌তে লাগল ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে। কি জানি যদি সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথাও দেখা হ'য়ে যায়!

এমনি করে অনাহারে, অনিদ্রায়, দশদিন ধ'রে ক্রমাগত চল্‌তে চল্‌তে শেষে তারা একটা খুব নির্জন জায়গায় এসে পেঁছলো।

এই চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা অতি নির্জন স্থানটি ও প্রচুর ফল-ফুলের গাছ দেখতে পেয়ে তখন তারই মধ্যে তারা লুকিয়ে রইলো।

দেখতে দেখতে গাছের ফল খেয়ে এবং বনের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে নদেরচাঁদের দেহ এখন সুস্থ হ'য়ে উঠলো যে মহুয়ার সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলে, গাছে গাছে ওঠানামা করে, ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। তারা দু'জনে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল সেই বনের মধ্যে।

এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল!

এইবার নদেরচাঁদ মহুয়াকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন স্থির করলেন।

এমন সময় একদিন সেই বনে হঠাৎ একটা বেদের বাঁশী বেজে উঠলো। তাই শুনে ভয়ে মহুয়ার মুখ কালী হ'য়ে গেল।

এ যে সেই হুম্‌ড়ো সর্দারের বাঁশী!

ছুটে গিয়ে সে নদেরচাঁদকে বল্‌লে শিগ্‌গির পালিয়ে চলো। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। তৎক্ষণাৎ তারা দু'জনে পালাল সেই স্থান ছেড়ে। মহুয়া আর নদেরচাঁদ লুকিয়ে লুকিয়ে খুব সাবধানে বনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে যাতে না কেউ দেখতে পায়।

কিন্তু হায়! বেশীদূর আর তাদের যেতে হ'লো না।

হুম্‌ড়ো সর্দার তার দলবল নিয়ে সেখানে যে লুকিয়েছিল তারা বুঝতে পারেনি। হুড়মুড় করে এসে চারিদিক থেকে তারা একেবারে ঘিরে ফেল্‌লে তাদের দু'জনকে।

মহুয়া মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

একখানা বিষ-মাখানো ছোরা হাতে ক'রে হুম্‌ড়ো সর্দার এবার এগিয়ে এলো এবং মহুয়ার হাতে সেখানা গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, "এখনো

সময় আছে—যদি ভাল চাস্ তো এই ছোরাখানা নদেরচাঁদের বুকে বসিয়ে দে। আমি সুজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, সব ঠিক করে রেখেছি—তোর কোন চিন্তা নেই। সুজন আমার শিষ্য—আমার স্বজাতি ও স্বগোত্র।”

মহুয়া কোন কথা না ব'লে ছোরাখানা হুম্‌ড়ো সর্দারের হাত থেকে নিয়েই চক্ষের নিমেষে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—মহুয়া একজন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে স্বামী বল্‌তে পার্‌বে না—তার চেয়ে মৃত্যু তার কাছে অনেক ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে মহুয়ার কথা জড়িয়ে এলো আর সারা দেহ কঠিন ও হিম হ'য়ে গেল।

তখন হুম্‌ড়ো সর্দারের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়লো নদেরচাঁদের ওপর।

তারা সবাই মিলে তখন নদেরচাঁদকে ঘিরে ধরে লাঠিসোঁটা যে যা পারলে তাই দিয়ে তাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে দিলে।

করতে, দেখবে যা হারিয়েছ আবার সব ফিরে আস্‌বে।”

সদাগর বল্‌লে, “কিন্তু কি নিয়ে বাণিজ্য কর্‌বো? আমার যে কিছু মূলধন নেই।”

শুকপাখী বল্‌লে, “তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে ওইটে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রী করো না, তাহ'লেই তো অনেক টাকা পাবে। তা দিয়ে তোমার ভাঙা নৌকো মেরামত ক'রে নিয়ে সোজা চ'লে যাও। দেখবে সেখানে বাণিজ্য ক'রে এক বছরে যা রোজগার কর্‌বে বারো বছর ধ'রেও তা খেয়ে ফুরোতে পারবে না।”



ওগো পাখী, আমায় বলে দাও, কি করলে আমার দুঃখ ঘুচবে?

এই কথা শুনে ধনেশ্বরের বুকে যেন নতুন বল ফিরে এলো। সে আর এক মুহূর্ত দেরী না ক'রে চ'লে গেল শহরে। সত্যি সেখানে আংটিটা তখনি সে বিক্রী ক'রে অনেক টাকা পেলে। তারপর সেই টাকা দিয়ে ভাঙা নৌকোটা মেরামত ক'রে নিয়ে ব্যবসা করতে চল্‌লো পুবদেশে।

সময় আছে—যদি ভাল চাস্ তো এই ছোরাখানা নদেরচাঁদের বুকে বসিয়ে দে। আমি সুজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, সব ঠিক করে রেখেছি—তোর কোন চিন্তা নেই। সুজন আমার শিষ্য—আমার স্বজাতি ও স্বগোত্র।"

মহুয়া কোন কথা না ব'লে ছোরাখানা হুম্‌ড়ো সর্দারের হাত থেকে নিয়েই চক্ষের নিমেষে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—মহুয়া একজন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে স্বামী বল্‌তে পার্‌বে না—তার চেয়ে মৃত্যু তার কাছে অনেক ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে মহুয়ার কথা জড়িয়ে এলো আর সারা দেহ কঠিন ও হিম হ'য়ে গেল।

তখন হুম্‌ড়ো সর্দারের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়লো নদেরচাঁদের ওপর।

তারা সবাই মিলে তখন নদেরচাঁদকে ঘিরে ধরে লাঠিসোঁটা যে যা পারলে তাই দিয়ে তাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে দিলে।

করতে, দেখবে যা হারিয়েছ আবার সব ফিরে আসবে।”

সদাগর বললে, “কিন্তু কি নিয়ে বাণিজ্য করবো? আমার যে কিছু মূলধন নেই।”

শুকপাখী বললে, “তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে ওইটে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রী করো না, তাহ’লেই তো অনেক টাকা পাবে। তা দিয়ে তোমার ভাঙা নৌকো মেরামত ক’রে নিয়ে সোজা চ’লে যাও। দেখবে সেখানে বাণিজ্য ক’রে এক বছরে যা রোজগার করবে বারো বছর ধ’রেও তা খেয়ে ফুরোতে পারবে না।”



ওগো পাখী, আমায় বলে দাও, কি করলে আমার দুঃখ ঘুচবে?

এই কথা শুনে ধনেশ্বরের বুকে যেন নতুন বল ফিরে এলো। সে আর এক মুহূর্ত দেরী না ক’রে চ’লে গেল শহরে। সত্যি সেখানে আংটিটা তখনি সে বিক্রী ক’রে অনেক টাকা পেলে। তারপর সেই টাকা দিয়ে ভাঙা নৌকোটা মেরামত ক’রে নিয়ে ব্যবসা করতে চললো পুবদেশে।

শুক পাখী যেমন বলেছে সেইমত সদাগর চললো। এক দিন সে বড় ব্যবসায়ী ছিল, তার যেমন পথঘাট সব চেনা-জানা তেমনি ব্যবসাও কিছু অজানা নয়। বাণিজ্য ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সাধু ধনেশ্বর তাই আবার প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগল।

দেখতে দেখতে আবার ধনদৌলত উপ্‌চে পড়লো তার ঘরে। হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, বাড়ীঘর, আবার সব হ'লো। আবার সুখ, আবার শান্তি, আবার লক্ষ্মী এলো ঘরে।

অভাব ঘুচলো। এইবার সদাগরের মনে জাগল কাজলরেখার বিয়ের চিন্তা।

তখন আবার একদিন ধনেশ্বর শুকপাখীকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওগো পাখী, বলো আমার মেয়ের কবে বিয়ে হবে? সে যে এগারো পেরিয়ে বারোয় পড়লো। অথচ বিয়ের কোন কিছুই এখনো স্থির হ'লো না।"

শুকপাখী বল্‌লে, "সদাগর, তোমার সব দুঃখ দূর হ'য়েছে কিন্তু এ দুঃখ দূর হ'তে এখনো অনেক দেরী। কাজলরেখার বিয়ে হবে এক মরা স্বামীর সঙ্গে, তাই তাকে আর ঘরে না রেখে এখুনি বনবাস দিয়ে এসো।"

এঁ্যা, মরা স্বামী! এই নিষ্ঠুর কথা শুনে সদাগর ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। একমাত্র মেয়ে, এমন সোনার প্রতিমা—তাকে বিসর্জন দিতে হবে। বাপ হ'য়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে মরা স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবো!' এই ব'লে সে অনুশোচনা করতে লাগলো।

কিন্তু শুকপাখীর কথা মিথ্যা হবার নয়। সন্ন্যাসী বলে গেছেন। তাই ঘাটে ডিঙি সাজিয়ে একদিন সদাগর কাজলরেখাকে বল্‌লে, "চলো মা, আজ আমরা বাপ-বেটীতে বাণিজ্য করতে যাই।"

কাজলরেখা এর আগে বহুবার পিতার সঙ্গে বহুস্থানে গিয়েছিল। তাই সরলমনে সেজেগুজে সে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

পালে হাওয়া লেগে ডিঙি ছুট্‌লো শন্‌ শন্‌ ক'রে। বহুদূর যাবার পর নৌকোটা গিয়ে ভিড়লো একটা জঙ্গলের ধারে।

ধনেশ্বর কন্যাকে নিয়ে তখন সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুক্‌লো। পথ

চীৎকার ক'রে উঠলো, "বাবা, বাবা, আমার বড় ভয় করছে! তুমি শিগ্‌গির এসো। একটা মড়া এখানে পড়ে আছে, তার সারা দেহে ছুঁচ বেঁধা। আর তার মাথার কাছে একটা পিদিম জ্বলছে টিপ টিপ ক'রে।"

সদাগর তখন বললে, "ও মড়া নয় মা, ও তোর স্বামী। ওকে দেখে ভয় করিস্ না। তোর কপালে এই দুঃখ লেখা আছে, তা আমি কি করবো বল? শুকপাখী একদিন আমাকে এই কথাই বলেছিল, এখন তা হাতে হাতে ফলে গেল দেখছি।"

এই ব'লে সে আবার বললে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে জীবিত স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। তাই ওই মরা যুবকটির সঙ্গে আজ তোর বিয়ে হ'লো। সূর্য, চন্দ্র, বনের দেবতাকে সাক্ষী ক'রে আমি আজ ওর-ই হাতে তোকে সমর্পণ ক'রে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি। যদি একমনে, একপ্রাণে তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারিস্ তবে নিশ্চয়ই একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন—ওই মরা স্বামীই আবার বেঁচে উঠবে। আমার কথা মিথ্যে হ'বে না। এ তোর বাবার আশীর্বাদ মা!"

এই বলতে বলতে বাপও যত কাঁদতে থাকে মেয়ে তার চতুর্গুণ কাঁদে। দু'জনের কেউ কারো মুখ আর দেখতে পেলে না। অবশেষে সদাগর একাই ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আর তার মেয়ে একাকিনী বন্দিনী হ'য়ে রইল সেই বন্ধদ্বার মন্দিরে।

অগত্যা সেই মৃত যুবকটির মাথার কাছে ব'সে ব'সে কাজলরেখা কাঁদতে লাগল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায় তবু সে কান্না থামে না।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ তার মনে হলো দরজায় একটা কিসের শব্দ হ'লো।

কাজলরেখা চমকে উঠে সামনে চাইতেই দেখলে দ্বার উণ্মুক্ত আর দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

যে বন্ধ দোরটা খোল্‌বার জন্য তারা বাপ-বেটীতে কত মাথা

শুক পাখী যেমন বলেছে সেইমত সদাগর চললো। এক দিন সে বড় ব্যবসায়ী ছিল, তার যেমন পথঘাট সব চেনা-জানা তেমনি ব্যবসাও কিছু অজানা নয়। বাণিজ্য ক'রে অল্পদিনের মধ্যে সাধু ধনেশ্বর তাই আবার প্রচুর অর্থ উপার্জন কর্তে লাগল।

দেখতে দেখতে আবার ধনদৌলত উপ্চে পড়লো তার ঘরে। হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, বাড়ীঘর, আবার সব হ'লো। আবার সুখ, আবার শান্তি, আবার লক্ষ্মী এলো ঘরে!

অভাব ঘুচলো। এইবার সদাগরের মনে জাগল কাজলরেখার বিয়ের চিন্তা।

তখন আবার একদিন ধনেশ্বর শুকপাখীকে জিজ্ঞাসা কর্লে, "ওগো পাখী, বলো আমার মেয়ের কবে বিয়ে হবে? সে যে এগারো পেরিয়ে বারোয় পড়লো। অথচ বিয়ের কোন কিছুই এখনো স্থির হ'লো না।"

শুকপাখী বল্লে, "সদাগর, তোমার সব দুঃখ দূর হ'য়েছে কিন্তু এ দুঃখ দূর হ'তে এখনো অনেক দেরী। কাজলরেখার বিয়ে হবে এক মরা স্বামীর সঙ্গে, তাই তাকে আর ঘরে না রেখে এখুনি বনবাস দিয়ে এসো।"

এঁ্যা, মরা স্বামী! এই নিষ্ঠুর কথা শুনে সদাগর ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগলো। 'একমাত্র মেয়ে, এমন সোনার প্রতিমা—তাকে বিসর্জন দিতে হবে। বাপ হ'য়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে মরা স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবো!' এই ব'লে সে অনুশোচনা কর্তে লাগলো।

কিন্তু শুকপাখীর কথা মিথ্যা হবার নয়। সন্ন্যাসী বলে গেছেন। তাই ঘাটে ডিঙি সাজিয়ে একদিন সদাগর কাজলরেখাকে বল্লে, "চলো মা, আজ আমরা বাপ-বেটীতে বাণিজ্য কর্তে যাই।"

কাজলরেখা এর আগে বহুবার পিতার সঙ্গে বহুস্থানে গিয়েছিল। তাই সরলমনে সেজেগুজে সে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

পালে হাওয়া লেগে ডিঙি ছুট্‌লো শন্ শন্ ক'রে। বহুদূর যাবার পর নৌকোটা গিয়ে ভিড়লো একটা জঙ্গলের ধারে।

ধনেশ্বর কন্যাকে নিয়ে তখন সেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুক্‌লো। পথ

চীৎকার ক'রে উঠলো, "বাবা, বাবা, আমার বড় ভয় করছে। তুমি শিগ্‌গির এসো। একটা মড়া এখানে পড়ে আছে, তার সারা দেহে ছুঁচ বেঁধা। আর তার মাথার কাছে একটা পিদিম জ্বলছে টিপ টিপ ক'রে।"

সদাগর তখন বললে, "ও মড়া নয় মা, ও তোর স্বামী। ওকে দেখে ভয় করিস্ না। তোর কপালে এই দুঃখ লেখা আছে, তা আমি কি করবো বল? শুকপাখী একদিন আমাকে এই কথাই বলেছিল, এখন তা হাতে হাতে ফলে গেল দেখছি।"

এই ব'লে সে আবার বললে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে জীবিত স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। তাই ওই মরা যুবকটির সঙ্গে আজ তোর বিয়ে হ'লো। সূর্য, চন্দ্র, বনের দেবতাকে সাক্ষী ক'রে আমি আজ ওর-ই হাতে তোকে সমর্পণ ক'রে জন্মের মত বিদায় নিচ্ছি। যদি একমনে, একপ্রাণে তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারিস্ তবে নিশ্চয়ই একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন—ওই মরা স্বামীই আবার বেঁচে উঠবে। আমার কথা মিথ্যে হ'বে না। এ তোর বাবার আশীর্বাদ মা।"

এই বলতে বলতে বাপও যত কাঁদতে থাকে, মেয়ে তার চতুর্গুণ কাঁদে। দু'জনের কেউ কারো মুখ আর দেখতে পেলে না। অবশেষে সদাগর একাই ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আর তার মেয়ে একাকিনী বন্দিনী হ'য়ে রইল সেই বদ্ধদ্বার মন্দিরে।

অগত্যা সেই মৃত যুবকটির মাথার কাছে ব'সে ব'সে কাজলরেখা কাঁদতে লাগল। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায় তবু সে কান্না থামে না।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ তার মনে হলো দরজায় একটা কিসের শব্দ হ'লো।

কাজলরেখা চমকে উঠে সামনে চাইতেই দেখলে দ্বার উণ্মুক্ত আর দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

যে বন্ধ দোরটা খোলবার জন্য তারা বাপ-বেটীতে কত মাথা

খোঁড়াখুঁড়ি করেছে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর হাতের ছোঁয়ায় নিমেষে তা খুলে গেল।

বিস্মিত, হতচকিত কাজলরেখা। ভাবলে, নিশ্চয়ই এ সন্ন্যাসী কোন যাদুবিদ্যা জানেন। ইচ্ছা করলে হয়তো এখুনি তার মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

তাই সে কাঁদ্তে কাঁদ্তে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়লো। তারপর তার সেই মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো।

কাজলরেখার কান্নায় সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো। তার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন তিনি।

তখন পায়ের ওপর থেকে তার মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে তিনি বল্‌লেন, "মা, তুই কাঁদিস্ না—তোর কোন ভয় নেই। এই মৃত যুবকটি এক রাজপুত্তুর—আমি তাকে এখানে এনে রেখেছি। ওর দেহ থেকে আগে একটা একটা ক'রে সব ছুঁচগুলো তুই তুলে ফেল্। তারপর স্নান ক'রে এসে শুধু চোখের পাতা হু'টো খুলে, আমি এই যে গাছের পাতা দিয়ে যাচ্ছি তার রস ঢেলে দিবি, তাহ'লেই আবার সে বেঁচে উঠবে।"

কিন্তু একটা কথা, তোকে সাবধান ক'রে দিই—"মা তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে—কাজেই তাড়াতাড়ি সেটা খণ্ডনের চেষ্টা করিস্ না। যতদিন না আবার শুকপাখী অনুমতি দেবে ততদিন তুই স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিবি না। যত দুঃখেই পড়িস্‌না কেন কখনো তাকে জানতে দিবি না যে তুই তার স্ত্রী। আর যদি আমার এই কথা অবহেলা ক'রে নিজের পরিচয় দিস্, তবে যেদিন তাকে বল্‌বি সেইদিন-ই তুই বিধবা হবি, স্মরণ থাকে যেন।"

এই কথা ব'লে কতকগুলো গাছের পাতা কাজলরেখার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী তখনি কোথায় চ'লে গেলেন।

তখন সন্ন্যাসীর কথামত কাজলরেখা একটি একটি ক'রে ছুঁচ তুলতে বসলো মৃত রাজকুমারের দেহ থেকে।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল তার বুকটা।

এদিকে মেয়েটি করলে কি—মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি সেই পাতাগুলো বাঁটলে এবং মৃতদেহের দু'চোখ থেকে ছুঁচ দু'টো খুলে ফেলে সেই রস তার দু'চোখে ঢেলে দিলে।

মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ জীবিত হ'য়ে উঠলো।

সুন্দর দিব্যকান্তি রাজকুমারকে দেখে মেয়েটি বললে, "কুমার, আমায় বিয়ে করো।"

রাজকুমার বললে, "তুমি আমার জীবন দিয়েছো। আমি ধর্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় বিয়ে করবো। আজ থেকে তুমি আমার ধর্মপত্নী—গৃহলক্ষ্মী।"

মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি বংশের কথা পর্যন্ত রাজকুমার কাঁকনদাসীকে জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু তার প্রাণদাত্রী ব'লে তাকে বিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা করলে।

এমন সময় স্নান ক'রে কাজলরেখা সেখানে ফিরে এলো এবং মন্দিরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠলো! দেখলে তার স্বামী বেঁচে উঠেছে।

কাজলরেখার অসাধারণ রূপ দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

রাজকুমারের এ রকম অবস্থা দেখে নকলরানী কাঁকনদাসী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—"ও অন্য কেউ নয়, ও আমাদের ঝি—ওর নাম কাজলরেখা।"

আসলরানী কাজলরেখার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে রাজপুত্র তাকে দাসী ব'লেই মেনে নিলো।

এদিকে দেবতার বরে রাজকুমারের একে একে সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগল। কোথায় তাদের দেশ—কে তার বাপ, কে তার মা, কেনই বা সে এখন এখানে—সব মনে প'ড়ে গেল।

তখন রাজকুমার আর কালবিলম্ব না ক'রে রানীকে ও দাসীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। বাপ-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের

খোঁড়াখুঁড়ি করেছে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর হাতের ছোঁয়ায় নিমেষে তা খুলে গেল!

বিস্মিত, হতচকিত কাজলরেখা! ভাবলে, নিশ্চয়ই এ সন্ন্যাসী কোন যাদুবিদ্যা জানেন। ইচ্ছা করলে হয়তো এখুনি তার মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

তাই সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়লো। তারপর তার সেই মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো।

কাজলরেখার কান্নায় সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো! তার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন তিনি।

তখন পায়ের ওপর থেকে তার মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে তিনি বল্‌লেন, "মা, তুই কাঁদিস্ না—তোর কোন ভয় নেই। এই মৃত যুবকটি এক রাজপুত্তুর—আমি তাকে এখানে এনে রেখেছি। ওর দেহ থেকে আগে একটা একটা ক'রে সব ছুঁচগুলো তুই তুলে ফেল্। তারপর স্নান ক'রে এসে শুধু চোখের পাতা দু'টো খুলে, আমি এই যে গাছের পাতা দিয়ে যাচ্ছি তার রস ঢেলে দিবি, তাহ'লেই আবার সে বেঁচে উঠবে।"

কিন্তু একটা কথা, তোকে সাবধান ক'রে দিই—"মা তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে—কাজেই তাড়াতাড়ি সেটা খণ্ডনের চেষ্টা করিস্ না। যতদিন না আবার শুকপাখী অনুমতি দেবে ততদিন তুই স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিবি না। যত দুঃখেই পড়িসনা কেন কখনো তাকে জান্‌তে দিবি না যে তুই তার স্ত্রী! আর যদি আমার এই কথা অবহেলা ক'রে নিজের পরিচয় দিস্, তবে যেদিন তাকে বল্‌বি সেইদিন -ই তুই বিধবা হবি, স্মরণ থাকে যেন।"

এই কথা ব'লে কতকগুলো গাছের পাতা কাজলরেখার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী তখমি কোথায় চ'লে গেলেন।

তখন সন্ন্যাসীর কথামত কাজলরেখা একটি একটি ক'রে ছুঁচ তুলতে বসলো মৃত রাজকুমারের দেহ থেকে।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল তার বুকটা।

এদিকে মেয়েটি করলে কি—মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি সেই পাতাগুলো বাটলে এবং মৃতদেহের দু'চোখ থেকে ছুঁচ দু'টো খুলে ফেলে সেই রস তার দু'চোখে ঢেলে দিলে।

মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ জীবিত হ'য়ে উঠলো।

সুন্দর দিব্যকান্তি রাজকুমারকে দেখে মেয়েটি বললে, "কুমার, আমায় বিয়ে করো।"

রাজকুমার বললে, "তুমি আমার জীবন দিয়েছো। আমি ধর্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি তোমায় বিয়ে করবো। আজ থেকে তুমি আমার ধর্মপত্নী—গৃহলক্ষ্মী।"

মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি বংশের কথা পর্যন্ত রাজকুমার কাঁকনদাসীকে জিজ্ঞাসা করলে না। শুধু তার প্রাণদাত্রী ব'লে তাকে বিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা করলে।

এমন সময় স্নান ক'রে কাজলরেখা সেখানে ফিরে এলো এবং মন্দিরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠলো। দেখলে তার স্বামী বেঁচে উঠেছে।

কাজলরেখার অসাধারণ রূপ দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

রাজকুমারের এ রকম অবস্থা দেখে নকলরানী কাঁকনদাসী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—"ও অন্য কেউ নয়, ও আমাদের ঝি—ওর নাম কাজলরেখা।"

আসলরানী কাজলরেখার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে রাজপুত্র তাকে দাসী ব'লেই মেনে নিলো।

এদিকে দেবতার বরে রাজকুমারের একে একে সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগল। কোথায় তাদের দেশ—কে তার বাপ, কে তার মা, কেনই বা সে এখন এখানে—সব মনে প'ড়ে গেল।

তখন রাজকুমার আর কালবিলম্ব না ক'রে রানীকে ও দাসীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। বাপ-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের

প্রণাম করলো এবং একে একে সমস্ত ঘটনা বলতে লাগল। বাপ-মা তখন তাদের হারানিধিকে পেয়ে খুব আনন্দ করতে লাগল এবং রাজ্যে খুব ধুমধাম প'ড়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে বাপ-মা মারা গেলে রাজপুত্র নিজেই রাজা হ'লো। তখন নকলরানী কাঁকনদাসীর কথামত কাজলরেখা সব কাজ করতে থাকে। বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, জল তোলে, দিনরাত নকলরানীর সেবা-শুশ্রূষা করে। কিন্তু এত ক'রেও সে তার মন পায় না। নকলরানী তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অনবরত গালমন্দ দেয় এবং পাছে কাজলরেখা তার পরিচয় দিয়ে ফেলে এই ভয়ে সদাসর্বদা সে চোখে চোখে রাখতো কাজলরেখাকে।

কিন্তু রাজকুমারের মনে ক্রমশই সন্দেহ বাড়তে লাগল। যতই সে কাজলরেখাকে দেখতে লাগল, ততই তার চালচলন, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা এবং সকলের ওপর তার অনন্যসাধারণ রূপ দেখে মনে হ'তে লাগল, কিছুতেই সে দাসী হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভদ্রঘরের মেয়ে, পরিচয় গোপন ক'রে আছে।

রাজকুমার নানা রকম ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজলরেখাকে জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়, কিন্তু কিছুতেই সে তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তখন সে ভেবে আকুল হয়, কে এই রহস্যময়ী নারী?

সন্ন্যাসী ব'লেছিলেন, স্বামীকে আত্ম-পরিচয় দিলেই জন্মের মত বিধবা হবে। এই কথাটি কাজলরেখার মনে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল। তাই শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাজকুমারকে তার পরিচয় দিলে না। এইভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে লাগল। এ-যে তার বরাতের লিখন, কে খণ্ডাবে?

এদিকে যত দিন যেতে লাগল নকলরানীর স্বভাব-চরিত্রে রাজকুমার তত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। হাজার হোক, সে তো ছোট-ঘরের মেয়ে! তার চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সবই যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগল! তার মধ্যে যেন কোন রুচি নেই, কোন শোভনতা-বোধ নেই। রাজরানীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ব'লে তাকে মনে হ'তে

কাজলরেখা মন্ত্রীকে এমন যুক্তি দিলে যে তাতে ক'রে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে গেল।

কাজলরেখার নামে তখন ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

রাজকুমার দেশভ্রমণ থেকে ফিরে আস্তেই মন্ত্রী চুপিচুপি তাকে সেই সব কথা জানালে। আর এ-ছাড়াও অন্য উপায়ে তাদের পরীক্ষা কর্বার মতলব দিলে।

মন্ত্রী বল্লে, "পর পর ছ'দিন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো যাক। আর সেই রান্নার ভার একদিন পড়ুক কাজলরেখায় ওপর—একদিন পড়ুক নকলরানীর ওপর।"

রাজকুমার মন্ত্রীর কথামতই কাজ কর্লে।

প্রথম দিন রান্নার ভার পড়লো নকলরানীর ওপর।

রাজকুমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসলো। নকলরানী তাদের পাতে পরিবেষণ কর্লো—কড়াইয়ের ডাল, কচুর শাকের তরকারী আর তেঁতুলের অম্বল। বন্ধু-বান্ধবদের সাম্নে এই সব খাবার দেখে রাজকুমার লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা স্নান ক'রে এসে কাজলরেখা রান্নাঘরে ঢুক্লো। অনেক বেলা পর্যন্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাক ক'রে ঘর ভরিরে দিলে সে।

সরু চালের ভাত, ভাল ভাল মাছের কালিয়া, পোলাও, পিঠে-পায়েস, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানা রকম খাবার সোনার থালায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাজকুমার ও তার বন্ধুদের খেতে দিলে। তারা সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হ'য়ে খেয়ে উঠলো। কারো পাতে কিছু পড়ে রইল না।

তারপর খাওয়া শেষ হ'তেই কাজলরেখা সোনার পাত্র ক'রে তাদের হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে এবং কেয়াখয়ের-দেওয়া সুগন্ধ পান সেজে খেতে দিলে। খুশীতে রাজকুমারের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু পরীক্ষা এতেও শেষ হ'লো না।

প্রণাম কর্‌লো এবং একে একে সমস্ত ঘটনা বল্‌তে লাগল। বাপ-মা তখন তাদের হারানিধিকে পেয়ে খুব আনন্দ কর্‌তে লাগল এবং রাজ্যে খুব ধুমধাম প'ড়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে বাপ-মা মারা গেলে রাজপুত্র নিজেই রাজা হ'লো। তখন নকলরানী কাঁকনদাসীর কথামত কাজলরেখা সব কাজ কর্‌তে থাকে। বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, জল তোলে, দিনরাত নকলরানীর সেবা-শুশ্রূষা করে। কিন্তু এত ক'রেও সে তার মন পায় না। নকলরানী তাকে হু'চক্ষে দেখতে পারে না। অনবরত গালমন্দ দেয় এবং পাছে কাজলরেখা তার পরিচয় দিয়ে ফেলে এই ভয়ে সদাসর্বদা সে চোখে চোখে রাখতো কাজলরেখাকে।

কিন্তু রাজকুমারের মনে ক্রমশই সন্দেহ বাড়তে লাগল। যতই সে কাজলরেখাকে দেখতে লাগল, ততই তার চালচলন, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা এবং সকলের ওপর তার অনন্যসাধারণ রূপ দেখে মনে হ'তে লাগল, কিছুতেই সে দাসী হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভদ্রঘরের মেয়ে, পরিচয় গোপন ক'রে আছে।

রাজকুমার নানা রকম ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজলরেখাকে জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়, কিন্তু কিছুতেই সে তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তখন সে ভেবে আকুল হয়, কে এই রহস্যময়ী নারী?

সন্ন্যাসী ব'লেছিলেন, স্বামীকে আত্ম-পরিচয় দিলেই জন্মের মত বিধবা হবে। এই কথাটি কাজলরেখার মনে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল। তাই শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাজকুমারকে তার পরিচয় দিলে না। এইভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ কর্‌তে লাগল। এ-যে তার বরাতের লিখন, কে খণ্ডাবে?

এদিকে যত দিন যেতে লাগল নকলরানীর স্বভাব-চরিত্রে রাজকুমার তত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। হাজার হোক্‌, সে তো ছোট-ঘরের মেয়ে! তার চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সবই যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। তার মধ্যে যেন কোন রুচি নেই, কোন শোভনতা-বোধ নেই। রাজরানীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ব'লে তাকে মনে হ'তে

কাজলরেখা মন্ত্রীকে এমন যুক্তি দিলে যে তাতে ক'রে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে গেল।

কাজলরেখার নামে তখন ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

রাজকুমার দেশভ্রমণ থেকে ফিরে আসতেই মন্ত্রী চুপিচুপি তাকে সেই সব কথা জানালে। আর এ-ছাড়াও অন্য উপায়ে তাদের পরীক্ষা করবার মতলব দিলে।

মন্ত্রী বললে, "পর পর দু'দিন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো যাক। আর সেই রান্নার ভার একদিন পড়ুক কাজলরেখার ওপর—একদিন পড়ুক নকলরানীর ওপর।"

রাজকুমার মন্ত্রীর কথামতই কাজ করলে।

প্রথম দিন রান্নার ভার পড়লো নকলরানীর ওপর।

রাজকুমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসলো। নকলরানী তাদের পাতে পরিবেষণ করলো—কড়াইয়ের ডাল, কচুর শাকের তরকারী আর তেঁতুলের অম্বল। বন্ধু-বান্ধবদের সামনে এই সব খাবার দেখে রাজকুমার লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা স্নান ক'রে এসে কাজলরেখা রান্নাঘরে ঢুকলো। অনেক বেলা পর্যন্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাক ক'রে ঘর ভরিয়ে দিলে সে।

সরু চালের ভাত, ভাল ডাল মাছের কালিয়া, পোলাও, পিঠে-পায়েস, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানা রকম খাবার সোনার থালায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাজকুমার ও তার বন্ধুদের খেতে দিলে। তারা সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হ'য়ে খেয়ে উঠলো। কারো পাতে কিছু পড়ে রইল না।

তারপর খাওয়া শেষ হ'তেই কাজলরেখা সোনার পাত্রে ক'রে তাদের হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে এবং কেয়াখয়ের-দেওয়া সুগন্ধ পান সেজে খেতে দিলে। খুশীতে রাজকুমারের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু পরীক্ষা এতেও শেষ হ'লো না।

আবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রাত্রে রাজকুমার তাদের দু'জনকে আল্পনা দিতে বললে পূজোর জায়গায়। এবার সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, "পূজো দেখতে বহুলোক আসবে, কাজেই আল্পনা যেন যতদূর সম্ভব সুন্দর হয়।"

নকলরাণীর আল্পনা দেখে সবাই বললে, "বিশ্রী"। কতকগুলো কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, তেঁতুল পাতা, ধানের শিষ ছাড়া আর কিছুই সে আঁকেনি। রাজকুমার ভারী চটে গেল।

তারপর সবাই গেল কাজলরেখার আল্পনা দেখতে। তার হাতের সুন্দর কারুকার্য দেখে সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেল। কত সুন্দর দেব-দেবীর ছবি, কত মন্দির, কত পদ্মপাতা, রাজহাঁস, পাহাড়-পর্বত, নদীর তীর, ভাঙা মন্দিরের মাঝে শুয়ে আছে রাজপুত্র—তার সর্বাঙ্গে ছুঁচ-বেঁধা—কাজলরেখা এঁকেছে।

তখন রাজকুমার, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র—সবাই এবিষয়ে একমত হলো যে, কাজলরেখা নিশ্চয়ই কোন ভদ্রবংশের মেয়ে—পরিচয় গোপন ক'রে দাসী হয়ে আছে।

এইভাবে দশ বছর কেটে গেল।

এদিকে শুকপাখীর কাছে কাজলরেখা রোজ গোপনে কান্নাকাটি করে এবং জিগ্যেস করে তার বাপ-মা-ভাইয়ের খবর—জিগ্যেস করে কবে তার এই দুঃখের শেষ হবে?

একদিন গভীর রাত্রে শুকপাখী কাজলরেখাকে ডেকে বললে, "তোমার বাপ-মা-ভাই—সবাই ভাল আছে কিন্তু তোমার অভাবে তারা দিনরাত কাঁদে, কারো মনে সুখ নেই। আর তোমার দুঃখ শেষ হতে আরো দু'বছর দেরী।"

"আরো দু'বছর?—সে-যে অনেকদিন!" এই ব'লে কাজলরেখা রোজ রাত্রে কাঁদে!

এইভাবে কাটলো আরো কিছুদিন। তারপর এক নূতন ঘটনা ঘট্‌লো।

রাজকুমারের এক বন্ধু কাজলরেখাকে দেখে বিয়ে করবার জন্য

পাগল হয়ে উঠলো। সে গোপনে নকলরাণীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলো।

তাতে নকলরাণীর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কাজলরেখা তার চক্ষুঃশূল। তার ওপর অনবরত রাজকুমারকে তার রূপ-গুণের প্রশংসা করতে শুনে হিংসায় তার বুক ফেটে যেতো। সে কাজলরেখাকে সকলের চোখে হীন ও দুশ্চরিত্র প্রমাণ করবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করলে।

বেচারী কাজলরেখা এ সবের কিছুই জানতো না।

নকলরাণী কুচক্রে ফেলে তাকে রাজকুমারের বিষ নজরে ফেললে।



নকলরাণীর সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধিতে দাসী কাজলরেখা পেরে উঠবে কেন? রাজকুমার তখুনি কলঙ্কিনী কাজলরেখাকে বনবাস দেবার হুকুম দিলেন।

কাজলরেখা কেঁদে আকুল হ'য়ে রাজকুমারের হাতে পায়ে ধরতে লাগল। বললে, "আমি নিষ্পাপ, কোন দোষ করিনি—আমাকে রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিও না। বাইরে কুকুর-বিড়ালের মত কোথাও পড়ে থাকবো।"

রাজকুমার তার কথায় কর্ণপাত করলে না। সেই বন্ধুর সঙ্গে একটা ডিঙি ক'রে সেইদিন-ই তাকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিল।

কত গ্রাম, কত নদ-নদী পার হ'য়ে ডিঙি ছুট্‌লো। শেষে এক অকূল সমুদ্রের মাঝে গিয়ে তারা পড়লো। যেদিকে চায় সেদিকেই অনন্ত নীলজলরাশি মিশে গেছে যেন আকাশের সঙ্গে।

কাজলরেখা কাঁদতে লাগল তার অদৃষ্টের কথা ভেবে।

রাজকুমারের বন্ধু তখন কাজলরেখাকে একলা পেয়ে বল্‌লে, "তুমি যদি আমায় বিয়ে করো তো তোমাকে বনবাসে না দিয়ে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবো—আমিও রাজকুমার। সেখানে আমারও রাজপ্রাসাদ আছে—তুমি হবে রাজরাণী। সোনার খাটে শুয়ে থাক্‌বে, কালিয়া-পোলাও খাবে, দাসদাসী তোমার হুকুমে উঠবে বস্‌বে। তোমার আর কোন দুঃখ থাক্‌বে না।"

কাজলরেখা তার প্রস্তাবে রাজী হ'লো না। সে বল্‌লে, "আমি দাসী, তায় কলঙ্কিনী। আপনি রাজকুমার, আমাকে বিয়ে করলে আপনার সম্মানের হানি হবে—লোকে আপনার কুযশ গাইবে। তার চেয়ে এইখানে আমায় ডুবিয়ে দিন—আমি জন্মের মত সকল দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাই।" এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে ডিঙি থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল।

রাজকুমারের বন্ধু তার হাতটা ধ'রে ফেলে বল্‌লে, "আমি কিছুতেই তোমায় আত্মহত্যা কর্‌তে দেবো না। তুমি আজ থেকে আমার রাণী হ'য়ে থাক্‌বে আমার রাজপুরী আলো ক'রে।" এই ব'লে সে মাঝিকে হুকুম দিলে তার দেশের দিকে যেতে।

ডিঙির মুখ ঘুর্‌লো। অন্যপথে তখন ডিঙি ভরা-পালে ছুটে চল্‌লো।

কাজলরেখা দেখলে বিপদ আরো বাড়লো। এখন কি ক'রে এই

দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তই চিন্তা করতে লাগলো।

সে অনেক অনুনয়-বিনয় করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। রাজকুমারের বন্ধু তার কথায় কর্ণপাত করলে না।

তখন কাজলরেখা হাতদুটো জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে, "মা সতীকুলরাণী, তুমি জানো এই হতভাগিনীর সকল দুঃখের কথা। কোন দোষ করিনি, তবুও স্বামীর চোখে আজ আমি অপরাধিনী। যদি কায়মনোবাক্যে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজো ক'রে থাকি—যদি আমি সতীসাধ্বী হই, তবে এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো মা—এই মুহূর্তে যেন সমুদ্রে চড়া পড়ে যায়।"

যেই এই কথা কাজলরেখা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে অমনি সমুদ্রে চড়া প'ড়ে নৌকো আট্‌কে গেল।

দাঁড়ি-মাঝিরা একবাক্যে ব'লে উঠলো, "এ মেয়ে ডাইনী, একে শীগ্‌গির নামিয়ে দাও ডিঙি থেকে।"

রাজকুমারের বন্ধুও আর দ্বিরুক্তি না করে তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দিলে সেখানে।

দেখতে দেখতে তখুনি আবার সমুদ্র জলে ভরে গেল—ডিঙি ভেসে উঠলো। রাজকুমারের বন্ধু লোকজন নিয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল দেশে।

জনমানবহীন সেই সমুদ্রের চড়ায় একাকিনী কাজলরেখা দিন কাটাতে লাগলো। শরকলমীর দাম ছাড়া অন্য কিছু সেখানে ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় পশুর মত সেইগুলো চিবিয়ে খেয়ে কোন রকমে কাজলরেখা প্রাণে বেঁচে রইলো।

এদিকে ততদিনে ধনেশ্বরের সংসারে কত পরিবর্তন ঘটলো। কাজলরেখার বাপ-মা মারা যেতে তার ভাই সাধু রত্নেশ্বর বাপের ডিঙি নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরুল।

নানা দেশ ঘুরে ব্যবসা ক'রে সে ফিরে আস্‌ছে, এমন সময় একদিন হঠাৎ ঝড়-তুফানে প'ড়ে তার ডিঙি একেবারে গিয়ে আটকাল

সেই চড়ায়।

ভাই বোনকে চেনে না। বোনও ভাইকে চেনে না। অতি শৈশবে তাদের হ'য়েছে ছাড়াছাড়ি।

রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে দেখে মুগ্ধ হ'লো এবং অনেক মিনতি ক'রে শেষে তাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজী করালে।

কিন্তু রত্নেশ্বরের বাড়ীতে পা দিয়েই কাজলরেখা চিন্‌তে পার্‌লে, এ তার নিজের বাড়ী। সেই ঘর, সেই দোর, সেই সব। সে কাউকে কিছু না ব'লে শুধু কাঁদতে লাগল। তার বাপ মারা গেছে —মা-ও মারা গেছে। পুরোনো লোকজন—তারাও অবস্থা খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে।

একদিন দু'দিন ক'রে তিন মাস কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে গিয়ে বল্‌লে, "তোমাকে হাঙ্গর, কুমীরের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে এখানে এনেছি শুধু বিয়ে কর্‌বো ব'লে। এই বাড়ীঘর সবই আমার কিন্তু স্ত্রী বিহনে সব অন্ধকার হ'য়ে আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তো কালই তোমায় বিয়ে করি। লোকজন, নাপিত, পুরোহিত—সবই আমি বাড়ীতে এনে ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু একবার তুমি বলো আমায় বিয়ে কর্‌বে।"

কাজলরেখা বল্‌লে, "আমার এক বাসনা আছে—সেটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমায় কথা দিতে পারি না। তা'ছাড়া আমার গোত্র, নামধাম না জেনে শুনে কোন্ শাস্ত্র অনুসারে তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

রত্নেশ্বর বল্‌লে, "রাজরাণীর মত যাকে দেখতে সে কি কখনো হাড়ি-মুচি হ'তে পারে? নিশ্চয়ই কোন উঁচু বংশে তোমার জন্ম। সত্যি ক'রে বলো, তোমার কোথায় বাড়ী, বাপ-মার নামই বা কি?"

কাজলরেখা বল্‌লে, "আমার পরিচয় আমি নিজ মুখে বল্‌তে পার্‌বো না। সুচরাজার ঘরে একটা শুকপাখী আছে, সে-ই আমার বিয়ের ঘটক, তাকে জিগ্যেস কর্‌লে সব জান্‌তে পার্‌বে।"

রত্নেশ্বর তখনি লোক পাঠালে সূচরাজার কাছ থেকে সেই পাখীটা আন্‌বার জন্যে। ডিঙি-ভরা ধনরত্ন নিয়ে লোক গেল সূচরাজার দেশে।

সূচরাজা তখন বাড়ী ছিলো না, দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল। কাজল-রেখাকে বনবাসে পাঠিয়েই সে তার ভুল বুঝতে পার্‌লে এবং তখনি নৌকো নিয়ে এদেশ ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল কাজলরেখার খোঁজে।

সেই অবসরে রত্নেশ্বর সাধুর লোক সূচরাজার বাড়ীতে গিয়ে সেই শুকপাখীটা চাইলে।

নকলরাণী ধনরত্নের লোভ সামলাতে না পেরে চুপিচুপি পাখীটাকে তাদের কাছে বিক্রী ক'রে দিলে।

পাখী নিয়ে তখনি রত্নেশ্বর সাধুর লোক দেশে ফিরে গেল।

এদিকে কতদিন কেটে গেল তবুও সূচরাজা কাজলরেখার কোন সন্ধান কর্‌তে পার্‌ল না। তারপর এমনিভাবে দেশে দেশে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে একদিন সে রত্নেশ্বরের দেশে গিয়ে পৌছল।

পাখী হাতে পেয়েই রত্নেশ্বর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দেশে ঘোষণা ক'রে দিলে যে, সে সমুদ্র থেকে জলপরী ধ'রে এনেছে—আজ তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং আরো ঘোষণা ক'রে দিলে যে, একটা শুকপাখী সভার মাঝে সকলের সামনে সেই পরীর জন্ম-বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর্‌বে।

যে শুন্‌লে সে-ই অবাক্ হ'য়ে গেল এবং এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখবার জন্য সবাই সব কাজ ফেলে ছুটলো সাধু রত্নেশ্বরের বাড়ী।

সূচরাজাও এই কৌতূহল সংবরণ কর্‌তে পার্‌লে না। অন্য লোকেদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লো।

বিরাট সভা। চারদিকে লোকজন গিস্‌গিস্ কর্‌ছে। মাঝখানে ব'সে আছে সাধু রত্নেশ্বর আর কাজলরেখা।

এমন সময় একটা সোনার খাঁচায় ক'রে শুকপাখীকে সেখানে নিয়ে

আসা হ'লো। খাঁচার দরজা খুলে দিতেই শুকপাখী তার ওপরে গিয়ে উঠে বস্‌লো। তারপর একে একে বল্‌তে লাগল কাজলরেখার জীবনের ইতিহাস।

—কাজলরেখা সাধু ধনেশ্বরের মেয়ে। কেন তার বাপ তাকে বনবাস দিলে? কেমন ক'রে মরা স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হ'লো। কেমন ক'রে কাঁকনদাসী নিজে রাণী হ'য়ে তাকে দাসী বানিয়ে রাখলে, —কেমন ক'রে ভ্রমবশতঃ রাজা তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে আবার বনবাসে দিলে—কেমন ক'রে রাজার বন্ধু তাকে বিয়ে করতে চাইলে, —কেমন ক'রে সমুদ্রে চড়া পড়লো—কেমন ক'রে আপন ভাই রত্নেশ্বর তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করতে চাইলে।

একে একে কাজলরেখার জীবনের ইতিহাস ব'লে শুকপাখী তিন্‌তলার ছাদে উড়ে গিয়ে বস্‌লো এবং সেখান থেকে আবার সূচরাজার জন্ম-বৃত্তান্ত বল্‌তে লাগলো।

চম্পানগরে সাধু হীরাধর নামে এক রাজা ছিল। বহুদিন পর্যন্ত কোন ছেলেপুলে না হওয়ায় তার মনে মোটে সুখ ছিল না। ছেলে হওয়ার জন্য রাজা অনেক দেবদেবীর আরাধনা করলে—পুজো, মানসিক প্রভৃতি কত কি করলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। শেষে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে তার হাতে একটি আম দিয়ে বল্‌লে, "এইটে রাণীকে খাওয়ালেই ছেলে হবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তপুরে গিয়ে রাণীকে সেই আমটা খাইয়ে দিলে। দশ মাস দশ দিন পরে রাণীর এক মরা ছেলে হ'লো।

ঠিক সেই সময় আবার সেই সন্ন্যাসী এসে দেখা দিল এবং সেই মরা শিশুটির সর্বাঙ্গে সূচ বিঁধিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে রেখে এলো। তারপর সেই নির্জন জঙ্গলে একটা মন্দির গেঁথে তার মধ্যে সেই শিশুটিকে রেখে দিলে।

দেবতার বরে সেই মরা শিশুটি তিল তিল ক'রে বাড়তে লাগলো। এইভাবে বাড়্‌তে বাড়্‌তে একদিন যখন তার যৌবন এলো, দেবতার বরে কাজলরেখাও সেইখানে গিয়ে মিলিত হ'লো।

আজ কাজলরেখার ব্রতের বারো বছর পূর্ণ হ'লো। আজ তার সকল দুঃখের অবসান হ'লো। তাই সমস্ত কথা আজ ব'লে গেলুম।

এই ব'লে শুকপাখী উড়ে গেল আকাশে।

সূচরাজা তখন ছুট্তে ছুট্তে ভীড় ঠেলে একেবারে কাজলরেখার কাছে গিয়ে হাজির হ'লো।

তখন রত্নেশ্বর নিজের বোনকে চিন্তে পার্লে এবং বিয়ের প্রস্তাব করার জন্য তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা করলে।

তারপর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রত্নেশ্বর সেইখানে বোন কাজল-রেখা ও সূচরাজার বিয়ে দিয়ে দিলে।

সূচরাজা তখন কাজলরেখাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল এবং কাজলরেখাকে বাড়ীর বাইরে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে বাড়ীর উঠানে একটা মস্ত বড় গর্ত তৈরী করালে।

এমন সময় নকলরাণী ছুটে এসে সূচরাজাকে গর্ত খোলার কারণ জিগ্যেস কর্লে।

সূচরাজা বল্লে, "আজ আমাদের বাড়ী লুঠ কর্তে আসবে একদল ডাকাত; তাই আমাদের সব ধনরত্ন নিয়ে এর মধ্যে লুকিয়ে থাক্তে হবে।"

যেই সেই কথা শোনা অমনি নকলরাণী নিজের গয়নাপত্তর নিয়ে সকলের আগে তার মধ্যে গিয়ে লুকালো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা লোকজনদের ইঙ্গিত করলে। তারা সকলে একসঙ্গে সেই গর্তে মাটি চাপা দিলে।

এই ভাবে নকলরাণীর মৃত্যু হ'লো। আর আসলরাণী কাজল-রেখা সূচরাজার সঙ্গে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

ফুলকুমার

গ্রামের নাম ভরাই।

সেখানে বাস করতো এক সদাগর। ধন-দৌলত তার এতো ছিলো যে লোকে তাকে বলতো লক্ষ্মীর বরপুত্র। কিন্তু এতো থাকা সত্ত্বেও তার মনে সুখ ছিলো না। কে ভোগ করবে এই ঐশ্বর্য? সে ছিলো নিঃসন্তান। ছেলে বা মেয়ে ভগবান তাকে একটিও দেয়নি। তাই সংসারের দিকে চাইলে তার মনে হ'তো সব অন্ধকার; বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতো! পুত্রহীন গৃহ মরুভূমির সমান! তাই কেবলই সে কাঁদ্তো আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো সন্তান! এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও কোন সন্তান হ'লো না দেখে একদিন সদাগর মনের দুঃখে নদীতে ডুবে মরতে গেল।

ঠিক সেই সময় একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন নদীর ধার দিয়ে। সদাগর তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদ্তে লাগলো।

সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো। তিনি সদাগরের হাতে একটা ফল দিয়ে বললেন, "এইটে শনি কি মঙ্গলবার রাণীকে খাইয়ে দিলেই, তোমার একটি পরমসুন্দরী মেয়ে হবে।"

সদাগর আবার তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিল। উঠে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী বললেন, "কিন্তু সাবধান, তার বয়েস ন'বছর পূর্ণ হ'লেই বিয়ে দিয়ো। তা না হ'লে ঘোরতর অশান্তি দেখা দেবে। তার পাপে তোমার দেহে শনি ঢুক্বে এবং রাজ্য পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।"

"তথাস্তু" ব'লে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে সদাগর বাড়ীতে গেল। এবং পরবর্তী শনিবারে সেই ফলটি খাইয়ে দিলে রাণীকে।

তার ঠিক দশমাস দশদিন পরে রাণীর একটি মেয়ে হ'লো। কিন্তু মেয়ে জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হ'লো।

সদাগর পত্নীর শোক সেই পদ্মফুলের মত মেয়েটিকে বুকে ক'রে ভুলে গেল।

এইভাবে একমাস, দু'মাস করতে করতে একবছর দু'বছর কেটে গেল।

মেয়েকে পেয়ে যেন সদাগরের ঐশ্বর্য উথলে উঠলো।

যা ছিল তা দ্বিগুণ হ'লো।



তখন মেয়েকে নিয়ে পরম আনন্দে তার দিন কাটতে লাগলো। নিত্য নূতন উৎসব, সমারোহ, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-চৈ-এর মধ্যে থেকে সদাগর একেবারে ভুলে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা।

ন'বছর পূর্ণ হ'তে মেয়ের যখন আর মাত্র ন'দণ্ড বাকী, ঠিক সেই সময় সদাগরের হঠাৎ মনে পড়লো সন্ন্যাসীর কথা।

এখন উপায়? ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। মাত্র ন'দণ্ড বাকী, এর মধ্যে কি ক'রে মেয়ের বিয়ের ঠিক করবে? কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে—একমাত্র মেয়ে, তার বিয়ে কতধুমধাম ক'রে হবে।

সদাগরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! কি হ'বে এই চিন্তা করতে করতেই আরো ছ'দণ্ড কেটে গেল।

মাত্র তিনদণ্ড আর বাকী! সদাগরের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। হাত-পা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

আরো দু'দণ্ড কেটে গেল। তখন সদাগর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, এখুনি যার মুখ দেখতে পাবো তারই হাতে মেয়েকে সঁপে দেবো।

এমন সময় দৈবপ্রেরিতের মত এক ভিখিরী বামুন এসে হাজির হ'লো সদাগরের কাছে।

অতিবৃদ্ধ। সমস্ত দেহ তার বেঁকে গেছে। হাত-পা কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ ক'রে, একটা মোটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে একেবারে সদাগরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কোলে একটী ছ'মাসের শিশুপুত্র, দু'চোখ তার অন্ধ। সদাগরের হাতে সেই ছেলেটির ভার সমর্পণ ক'রে ব্রাহ্মণ কাশী গিয়ে বাকী দিন ক'টা কাটাতে চায়। ভিক্ষা ক'রে সে নিজের পেট-চালাতে পারে না, তার ওপর এই শিশুর দুধ কেমন ক'রে জোগাবে! তাই ধনী সদাগরের কাছে এসেছে মাতৃহীন শিশুটিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে।

সদাগর আর একমুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে সেই অন্ধ পুত্রটীকে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নিয়ে নিলে। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করতে করতে চ'লে গেল।

তখন সেই অন্ধ শিশুটিকে কোলে নিয়ে সদাগর মেয়ের কাছে গেল।

সদাগর মেয়ের নাম রেখেছিল কাঞ্চনমালা। ন'বছরের মেয়ে যেন সোনার প্রতিমা! চাঁদের মত মুখ, পদ্মের পাপড়ির মত বড় বড় চোখ, মেঘের মত কালো একরাশ চুল মাথা থেকে একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়েছে।

মেয়েকে দেখে সদাগরের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শুধু ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগল দু'চোখ বেয়ে।

বাপের চোখে জল দেখে কাঞ্চনমালার বুক ফেটে যেতে লাগল। সেও তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাপকে জিজ্ঞাসা করলে, "শিশুটি কে!"

সদাগর তখন শিশুটিকে কাঞ্চনমালার হাতে সঁপে দিয়ে সেই সন্ন্যাসীর কথা একে একে বললে মেয়েকে।

কাঞ্চনমালার ভাগ্যে ছিল সেই ছ'মাসের শিশু অন্ধস্বামী! তাই সে বাপকে কিছু না ব'লে অন্ধশিশুটিকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলো ডুক্‌রে ডুক্‌রে।

মেয়ের এই দুঃখ চোখের সাম্‌নে সহ্য করতে না পেরে সদাগর সেখান থেকে চ'লে গেল।



কাঞ্চনের কান্না আর থামে না। মৃত মায়ের কথা মনে প'ড়ে আরো বেড়ে যায়। মা যদি বেঁচে থাক্‌তো তা হ'লে কি তার বাবা এই অন্ধশিশুটির সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতো। এই ব'লে নিজের সুখ-

দুঃখ ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সে পাগলের মত হ'য়ে গেল, এবং একদিন রাত্রে অন্ধকারে সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল।

গভীর রাত। লোকজন যে-যার বাড়ীতে ঘুমিয়েছে। চারদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার ওপর পথঘাট সব আজানা অচেনা। কোন্ দিকে যাবে কাঞ্চনমালা নিজেই জানে না। তাই পথ ঠিক করতে না পেরে যেতে যেতে সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

বনজঙ্গল ভেদ ক'রে সে চলতে লাগলো সেই শিশুটিকে বক্ষে নিয়ে। কাঁটায় তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেল। পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে সে একটা বটগাছের তলায় ব'সে পড়্লো এবং ব্যাকুলভাবে কাঁদ্তে লাগলো।

সেই বটগাছটা ছিলো ফাঁপা। তার কোটরের মধ্যে বাস করতেন এক সন্ন্যাসী। এত রাত্রে কে কাঁদ্ছে দেখবার জন্য তিনি বাইরে এলেন। কাঞ্চনমালাকে সেই অবস্থায় দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন, তুমি কোথায় যাবে? আর কেনই বা এখানে ব'সে কাঁদ্ছো?"

কাঞ্চনমালা কাঁদ্তে কাঁদ্তে সমস্ত কথা তাঁকে বললে। সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো। তিনি বললেন, "আজ রাত্তিরটা তুমি এই কোটরের মধ্যে থাক তারপর কাল সকালে যাহোক্ একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

কাঞ্চনমালা তাঁর কথামত রাত্তিরটা সেই গাছের কোটরে কাটিয়ে দিল।

ভোর হ'তেই সন্ন্যাসী বনের ভেতর থেকে একটা ফল সংগ্রহ ক'রে আনলেন এবং সেইটা কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে বললেন, "এইটা ওই শিশুটিকে খাইয়ে দাও তাহ'লে এখুনি সে চক্ষুষ্মান হ'য়ে উঠবে। তারপর এই বনের পথে বরাবর পূবদিকে গেলেই কতকগুলো কাঠুরিয়াদের ঘর দেখতে পাবে···সেখানে গিয়ে তোমার স্বামীকে নিয়ে থাকো। দু'মাসের বাড় এই শিশুটি একদিনে বাড়বে। তাছাড়া, আবার যদি কোনদিন কোন বিপদে পড়ো তো আমাকে স্মরণ ক'রো।" এই ব'লে সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সেই গাছের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। ফলটি

শিশুকে খাওয়াতেই সে চোখ মেলে চাইলো। তখন কাঞ্চনমালার বুকে বল এলো। সে সন্ন্যাসীর উপদেশ মত পুবদিকে চল্‌তে লাগলো।

সেইখানে এক কাঠুরে আর তার স্ত্রী বাস করতো। তারা ছিল নিঃসন্তান। তাই এই সুন্দরী মেয়েটিকে ও ফুট্‌-ফুটে ছেলেটিকে দেখে তাদের বড় লোভ হ'লো। তারা তখন কাঞ্চনমালাকে নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে। কাঞ্চনমালা সেইখানে মনের সুখে বাস করতে লাগলো।

কাঠুরের বৌকে সে ডাক্‌তো মা ব'লে। জন্মাবধি কোন দিন সে মায়ের মুখ দেখেনি, তাই তাকে পেয়ে সে মায়ের দুঃখ ভুললো। আর কাঠুরের স্ত্রীও মেয়ে কি জিনিস জানতো না, তাই কাঞ্চনমালাকে পেয়ে পেটের মেয়ের মত ভালবাসতে লাগলো।

কাঞ্চন রোজ তাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাট্‌তে যেতো এবং সেই কাঠ নিয়ে আবার বাজারে বেচে আসতো।

এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

দেখতে দেখতে কাঞ্চনের স্বামী হৃষ্ট-পুষ্ট হ'য়ে উঠলো। রাজপুত্রের মত তার চেহারা। কাঠুরেরা তার নাম রাখলে ফুলকুমার!

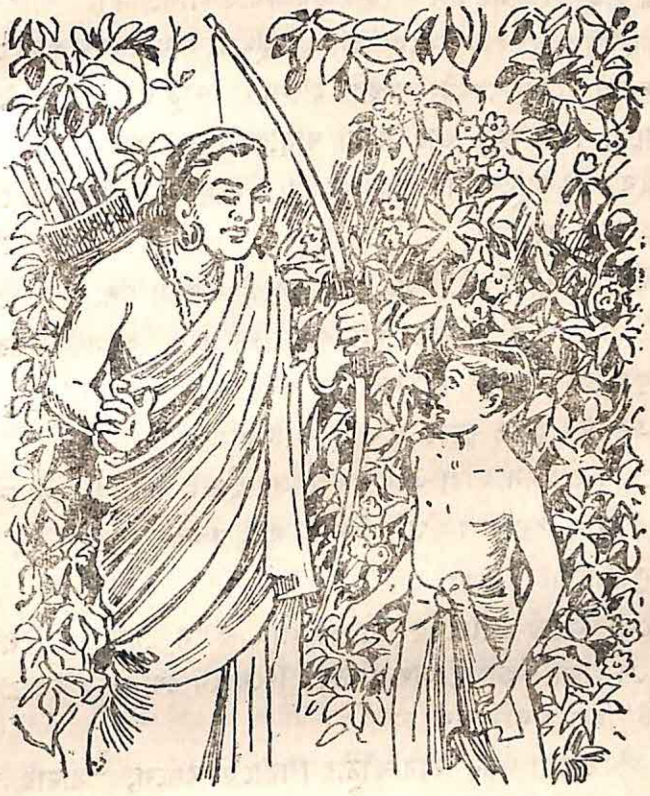
ফুলকুমার ছুটোছুটি করে, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খেলা করে।

তাকে বাড়ীতে রেখে একদিন কাঞ্চন কাঠুরেদের সঙ্গে কাছাকাছি একবনে গেল কাঠ কাট্‌তে।

এমন সময় একরাজা এক হরিণ শিকার করবার জন্য তার পিছু ছুটতে ছুটতে একেবারে এসে পড়লো সেই বনে। ফুলকুমারকে দেখে তিনি তার পানে এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন যে, শিকার ওদিকে গেল পালিয়ে। এই বিজন বনের মধ্যে এমন ফুটফুটে রাজপুত্তুর কোথা থেকে এলো! এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি একেবারে ফুলকুমারের কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন এবং তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "তোমার ঘর কোথায়?" ফুলকুমার সেই পাতার কুঁড়ে ঘর দেখিয়ে বললে, "ওই যে আমাদের বাড়ী।"

রাজার মনে কেমন অবিশ্বাস হ'লো। তিনি বললেন, "ও তো কাঠুরেদের ঘর!"

সে বললে, "আমরা যে কাঠুরে, ওইখানেই থাকি!" রাজা বললেন, "চলো দেখি তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?" ফুলকুমার



বললে, "আমাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই, সবাই কাঠ কাটতে গেছে বনে। একটু পরে সকলে ফিরে আসবে।"

যেই সেই কথা শোনা অমনি রাজার মনে একবুদ্ধি খেলে গেল। তাঁর সঙ্গে লোক-লস্কর অনেক ছিলো। তিনি করলেন কি— ফুলকুমারকে জোর ক'রে ধ'রে বেঁধে একেবারে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে লম্বা পাড়ি দিলেন নিজের রাজ্যে।

সেখানে বিরাট অট্টালিকা অগণিত দাসদাসী, বহুমূল্য আসবাব-

পত্র দেখে তো ফুলকুমারের চক্ষুস্থির! রাজপ্রাসাদ, রাজ-ঐশ্বর্য যে কি জিনিস ইতিপূর্বে কখনো সে দেখেনি। তাই অবাক হ'য়ে সে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

রাজা তাকে ভালো ভালো পোশাক পরিয়ে, উৎকৃষ্ট রাজভোগ খাইয়ে রাজার ছেলের মত ক'রে মানুষ করতে লাগলেন।

এদিকে বন থেকে ফিরে এসে ফুলকুমারকে ঘরে দেখতে না পেয়ে কাঞ্চনমালা কেঁদে-কেটে অস্থির হ'লো। কাঠুরেরা তাকে অনেক বোঝালে, কিন্তু তবুও তার কান্না থাম্‌লো না। তাই পরদিন অতি প্রত্যূষে সেই কাঠুরে-পিতা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল ফুলকুমারের সন্ধানে।

কত মাঠ-ঘাট, নদী-পর্বত অতিক্রম ক'রে তারা চলতে লাগলো। কত গ্রাম, কত নগর, কত ছোট-বড় রাজ্য তারা অনুসন্ধান করলে। ফুল কুমারের কিন্তু বৃথা। কেউ তার কথা বলতে পারলে না।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছ'বছর কেটে গেল।

শেষে একদিন তারা এসে পৌঁছলো সুমাই নগরে। সেখানকার রাজার নাম বিদ্যাধর। তাঁর একটি অতি সুন্দরী কন্যা আছে, তাঁর নাম কুঞ্জলতা।

সেই নগরে পৌঁছতেই কাঞ্চনমালার কানে গেল যে, সেইদিন সকালে রাজা বিদ্যাধর ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কন্যার জন্য একটি পরমা সুন্দরী দাসী চাই।

কাঞ্চনমালা তখন তার কাঠুরে-পিতাকে বললে, "আমার শরীর বড় খারাপ, আমি আর কোথাও যাবো না, এই রাজকন্যার দাসী হ'য়ে এইখানেই থাকবো।

অগত্যা কাঠুরে সেইখানে তাকে রেখে চ'লে গেল। রাজার লোকেরা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে ক'রে কুঞ্জলতার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা-রাজড়ার কাণ্ড! যেমন তেমন দাসী-বাঁদী হ'লে তো চলবে না! তাই রাজকুমারী কুঞ্জলতা আবার ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর দাসীকে দেখতে কেমন হবে। সোনার মত রঙ, পদ্মের পাপড়ির

মত টানা চোখ, মেঘের মত কালো চুল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এসে পড়েছে।

কাঞ্চনমালার সঙ্গে এই বর্ণনার অনেক মিল আছে দেখে রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে রাজকুমারীর কাছে।

কুঞ্জলতাও তাকে দেখে পচ্ছন্দ করলেন এবং তখনি কাঞ্চনমালার চাকরী মঞ্জুর হ'লো।

কাঞ্চনমালা জানতো না যে, ফুলকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কুঞ্জলতার। যে রাজা তাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন তিনি হ'লেন কুঞ্জলতার বাপ বিদ্যাধর।

তাই হঠাৎ যখন কাঞ্চনমালার সঙ্গে ফুলকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো সেখানে, তারা দু'জনে দু'জনকেই দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'লো। কুঞ্জলতার দাসী কাঞ্চনমালা হ'লেও সেইদিন থেকে সে সেবা-যত্ন করতে লাগলো ফুলকুমারকে।

তার প্রতিটি ছোট-বড় কাজ কাঞ্চনমালা নিজহাতে ক'রে দিতে লাগলো এবং সে না করলে ফুলকুমারেরও ভালো লাগত না।

এই দেখে কুঞ্জলতার মনে হিংসা হ'লো। তিনি কাঁদ্যাতে কাঁদ্তে তাঁর মাকে গিয়ে সব কথা বললেন। কাঞ্চনমালাকে তখন ফুলকুমারের চোখের সাম্নে থেকে কি ভাবে সরিয়ে দেওয়া যায় এই কথা তাঁরা মায়ে-ঝিয়ে চিন্তা কর্তে লাগলে।

এদিকে যতদিন যেতে লাগলো ফুলকুমারও তত বিরক্ত হ'তে লাগলো কুঞ্জলতার ওপর। কোন কাজ কুঞ্জলতা করলে তার ভাল লাগে না। বলে, কাঞ্চনমালাকে ডেকে দাও, সে করুক।"

কুঞ্জলতা শুধু কাঁদে। ফুলকুমারের ভয়ে কাঞ্চনমালাকে কিছু বলতে পারে না।

এমন সময় একদিন বহুলোকজন নিয়ে ফুলকুমার শিকার করতে গেল, দূরে কোন জঙ্গলে। যেতে আসতে দু'মাসের পথ।

এদিকে দু'মাসের মধ্যে রাজ্যে নানা অঘটন ঘটলো।

বৃদ্ধরাজা বিদ্যাধর একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। রাজার সঙ্গে

সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও পুরানো হাতীটাও মরে গেল কয়েকদিন পরে। তা'ছাড়া, আরো অনেক ছোট-বড় অশান্তি দেখা দিল রাজ্যে।

রাজার শোকে সবাই মুহ্যমান হ'য়ে পড়্লো। কুঞ্জলতার ও কান্না আর থামে না।

এই সুযোগে কুঞ্জলতা ও রাণীমা রটিয়ে দিলেন যে, কাঞ্চনমালা ডাইনী। তারি জন্যে এত অশান্তি ঘটছে রাজ্যে।

প্রজারাও সব তাই বিশ্বাস করলে। এদিকে ছ'মাস কেটে গেল। ফুলকুমার ফিরে এসে রাজা হ'লো। কিন্তু বিদ্যাধরের শোকে সর্বদা তার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাক্তো। বৃদ্ধ রাজা তাকে পুত্রের মত ভাল বাসতেন।

প্রজারা সকলে তখন একসঙ্গে ফুলকুমারকে গিয়ে বললে, "কাঞ্চন-মালা ডাইনী, তারই জন্যে রাজ্যে যত অশান্তি, এখুনি তাকে দূর ক'রে দিন।"

ফুলকুমার তাদের কথা বিশ্বাস করলে না। হেসে উড়িয়ে দিলে।

তখন ঘুস দিয়ে কতকগুলো লোককে কুঞ্জলতা বশ করলেন। তারা রাতে রাজার সেরা ঘোড়াকে ঘোড়াশালা থেকে চুরি ক'রে হত্যা করলে এবং তার রক্ত কাঞ্চনমালার বিছানায়, ঘরে-দোরে ছড়িয়ে দিয়ে পালালো।

পরদিন সকালে ফুলকুমারকে কাঞ্চনমালার ঘরে নিয়ে গিয়ে সবাই দেখালে সে-দৃশ্য। তখন রাজার মনে আর দ্বিধা রইল না। কাঞ্চনমালা যে ডাইনী, এ-কথা প্রমাণ হ'য়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ফুলকুমার সেই ডাইনীকে বহুদূরে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে নির্বাসন দেবার হুকুম দিলে।

কাঁদ্তে কাঁদ্তে কাঞ্চনমালা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

কুঞ্জলতা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটলো।

কিন্তু কাঞ্চনমালা যেদিন রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, সেদিন থেকে

ফুলকুমারের মনে অশান্তি দেখা দিল। কোন কাজে তার মন লাগে না। শুধু নির্জ্জনে বসে বসে কাঁদে আর কি ভাবে!

এদিকে বনের মধ্যে কাঞ্চনমালার কেঁদে কেঁদে দিন কাটতে লাগল। ঘোর অরণ্য—তার চারদিকে পাহাড়-পর্বত। কোন্ দিকে যাবে, কোন পথ চেনে না। তাই বন-জঙ্গল ও কাঁটার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা! এই ভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে বহুদিন পরে কাঞ্চনমালা একটা বনের মধ্যে এসে সেই বটগাছটাকে দেখতে পেলে এবং তার তলায় বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগল।

গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সন্ন্যাসী তার সামনে দাঁড়ালেন।

কাঞ্চনমালা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে একে একে সব দুর্ভাগ্যের কথা তাঁকে বললে।

সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই গাছের কোটরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখলেন এবং ব'লে দিলেন, তিনদিন যেন সে কোন মতেই আর গাছের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে। এই ব'লে কতকগুলো ফলমূল তাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

সারারাত সারাদিন ধ'রে সেই বনের মধ্যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কিসের শব্দ হয়। তরু-কোটর ভেদ ক'রে তা কাঞ্চনমালার কানে যায়। আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে। বাইরের দিকে চাইতে সাহস হয় না। সে ভাবে, এইজন্যেই বোধ হয় সন্ন্যাসী তাকে বাইরে আস্‌তে বারণ করেছিলেন!

যাই হোক, তিনদিন পরে সন্ন্যাসী আবার সেখানে এসে দেখা দিলেন এবং কাঞ্চনমালাকে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে আদেশ দিলেন।

কাঞ্চনমালা বাইরে এসে অবাক্ হ'য়ে গেল। চারদিকে বিরাট বিরাট অট্টালিকা! কত ঘর, কত দোর, কত তোরণ তার ঠিক নেই। ফুলকুমারের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ!

বিস্ময়াবিষ্টের মত কাঞ্চনমালা সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস্ করলেন, "এ প্রাসাদ কোন্ রাজার এবং কেমন ক'রেই বা এখানে এলো।"

সন্ন্যাসী বললেন, "এ তোমার প্রাসাদ মা, আজ থেকে তুমি এখানে থাকবে। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি একে লাভ করেছো"

কাঞ্চনমালা তখন সেই প্রাসাদে বাস করতে লাগলো।

এদিকে সন্ন্যাসী দেশ-বিদেশে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, এই বনে এক রাজকুমারী বাস করেন। তিনি একটা গান জানেন। আধখানা গান তিনি গাইবেন আর বাকী আধখানা যে রাজপুত্তুর গাইতে পারবেন, তিনি তাঁরই গলায় মালা দিবেন।

এই সংবাদ পেয়ে দেশ-বিদেশ থেকে বহু রাজকুমার ছুটে এলেন। কিন্তু কাঞ্চনমালা যখন তার জীবনের ইতিহাস অর্ধেকটা গেয়ে থেমে যায়, তখন বাকী অর্ধেকটা আর কেউ শেষ করতে পারেন না। তখন অপমানে সবাই নতমুখ হ'য়ে চলে যান।

একদিন হ'লো কি, কাঞ্চনমালা অর্ধেকটা গান গেয়ে যেই, থেমেছে, অমনি একটা অন্ধ ভিখিরী তার বাকী অর্ধেকটা গাইতে গাইতে একেবারে রাজসভার মধ্যে প্রবেশ করলো।

কাঞ্চনমালা তখন ছুটে গিয়ে তার গলায় মালা দিলে।

অন্যান্য রাজপুত্ররা সবাই ক্ষেপে গেলেন। বললেন, "ও তো ভিখিরী—রাজকুমার নয়। ওর সঙ্গে কেমন ক'রে বিয়ে হবে?"

কাঞ্চনমালা তখন ইন্দ্রাণীর মত দাঁড়িয়ে ওঠে বললে, "এই অন্ধ ভিখিরী—রাজা ফুলকুমার!"

রাজা ফুলকুমারের নাম শুনে সবাই চমকে উঠলেন এবং ভাল ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—হ্যাঁ, ফুলকুমারই তো বটে! তখন চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। অন্যান্য রাজপুত্ররা যে যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কাঞ্চনমালা অন্ধ স্বামীর পদসেবা করতে লাগল সেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে থেকে। এইভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল।

একদিন কাঞ্চনমালা ফুলকুমারকে জিগ্যেস্ করলে, "কেমন ক'রে

তোমার সুন্দর চোখ দু'টির এই অবস্থা হ'লো।"

ফুলকুমার বললে, "শুধু তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ অন্ধ হ'য়ে গেছে।"

এই কথা শুনে কাঞ্চনমালার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। সে তখন ছুটে সেই বনের মধ্যে চলে গেল এবং সেই বটগাছটার তলায় বসে কাঁদতে লাগল।

সন্ন্যাসী গাছ থেকে রেরিয়ে এসে বললেন, "রাজকুমারী, তুমি কি চাও, আবার কাঁদ্‌ছ কেন?"

কাঞ্চনমালার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বহুদিন পরে দেখা হ'লো। সে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "আমার অন্ধ স্বামীর চোখ দু'টি ভালো ক'রে দিন।"

সন্ন্যাসী বললেন, "একবার ভাল ক'রে দিয়েছি; আর পারবো না।"

কাঞ্চনমালা এই কথা শুনে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভিখারিণীর মত কাঁদ্‌তে লাগল।

সন্ন্যাসী তখন বনের মধ্যে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটা ফল হাতে ক'রে এসে কাঞ্চনকে বললেন, "এই ফলটা খেলেই তোমার স্বামী আবার চোখ ফিরে পাবে। কিন্তু সেই চোখে যেদিন তোমার মুখ দেখ্‌বে, সেইদিনই আবার অন্ধ হ'য়ে যাবে। আর কোন জন্মে এ অন্ধত্ব তার ঘুচবে না।"

কাঞ্চনমালা তখন আরো কাঁদ্‌তে লাগল। বললে, "এ-ছাড়া কি আর কোন উপায় নেই, প্রভু!"

"আছে।" ব'লে সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সেই গাছের গোড়ায় গিয়ে তিনবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ ক'রে টোকা মারলেন। অমনি তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল কুঞ্জলতা।

কুঞ্জলতাকে দেখে হিংসায় কাঞ্চনমালার দু'চোখ জ্বলে উঠলো। কেমন ক'রে এখানেও রাজকুমারী এলো এই ভেবে সে বিস্মিত হ'লো।

সন্ন্যাসী তখন সেই ফলটা কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে বললেন,

"এইটা যদি তুমি স্বামীর কল্যাণ কামনা ক'রে সরল অন্তঃকরণে কুঞ্জলতার হাতে দিতে পারো তো কুঞ্জলতা খেলেই তোমার স্বামী চক্ষুষ্মান হ'বে। কিন্তু তোমাকে দেখলেই অন্ধ হ'য়ে যাবে। এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় করো।"

এই ব'লে তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত, এই মনে ক'রে সরল ও সুস্থ মনে কাঞ্চনমালা সেই ফলটি কুঞ্জলতার হাতে তুলে দিয়ে চির-কালের মত সেই দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল, তা কেউ জানে না।

এদিকে কুঞ্জলতা সেই ফলটি খেতেই ফুলকুমার চক্ষুষ্মান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু কাঞ্চনমালা কৈ ?

চোখ খুলেই সে দেখলে কুঞ্জলতাকে।

তখন মিথ্যা ক'রে কুঞ্জলতা বল্‌লে, "সে রাক্ষসীর জন্যেই তো তুমি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলে এবং তোমাকে অন্ধ অবস্থায় রেখে সে পালিয়ে গেছে। আমি অনেক ব্রত উপবাস ক'রে অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে এই ফলটি পেয়েছি এবং তাই খেয়েই, তোমার চোখ দুটি আবার ফিরিয়ে এনেছি। সে ডাইনীর নাম আর মুখে এনো না।"

ফুলকুমার সেই ফলটার খোসা দেখে ভাবলে, কথাটা সত্যিই। তাই আর কাঞ্চনমালার নাম মুখে না এনে সুখে ও শান্তিতে কুঞ্জলতাকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগল।

দস্যু কেনারাম

অনেক পূজো মানসিক ক'রে, অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে শেষে দ্বিজ ফেলারাম এক সন্তান লাভ করলেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মুখে হাসি ফুট্‌লো। এতদিন তাঁরা ছিলেন ভারি মনোকষ্টে। সমাজে মুখ দেখাতে তাঁদের মাথা কাটা যেতো—



কি আছে শিগগির দে —নয় ত এখুনি এই খাঁড়া দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেলবো।

সবাই ঘৃণা কর্‌তো আঁটকুড়ো ব'লে। তাই বহুদিন পরে এই পুত্র লাভ ক'রে আনন্দে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের আঁধার ঘরে এতদিন পরে যেন আলো জ্বল্‌লো।

চাঁদের মত ছেলেটিকে দেখে মা ও বাপের মনে আর সুখ ধরে না। ছ'মাস বয়েস হ'তেই তাঁরা খুব ধুমধাম ক'রে ত তার অন্নপ্রাশন দিলেন

এবং পুত্রের নাম রাখলেন, কেনারাম।

কিন্তু এ সুখ তাঁদের কপালে বেশীদিন টিকল না। অন্নপ্রাশনের এক মাস পরেই কেনারামের মা মারা গেল। বেচারী ফেলারাম তখন মহা ফ্যাসাদে পড়লেন! স্ত্রীর জন্যে শোক করবেন, না মাতৃহীন শিশুটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন!

কে কাকে ছাখে?

ব্রাহ্মণ একলা, স্ত্রী ছাড়া তাঁর সংসারে আর কেউ ছিল না। তার ওপর টাকাকড়িরও বিশেষ সচ্ছলতা ছিল না। যজমানদের বাড়ী পূজো-পার্বণ, ক্রিয়াকলাপে যা পেতেন, তাইতেই সারা বছর কোন রকমে খেয়েপরে কেটে যেতো।

তাই ছেলেটিকে মানুষ করবার অন্য কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একদিন তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে শিশুটিকে বুকে ক'রে গিয়ে হাজির হ'লেন তাঁর শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ কেনারামের মামার বাড়ী। কেনারামকে সেখানে রেখে তিনি চলে গেলেন দিনকতকের জন্যে তীর্থ-ভ্রমণে।

মামা-মামীর আদরে কেনারাম রইল মামার বাড়ী। সেখানকার অবস্থা মন্দ নয়। জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তাঁদের যা আছে, তাতে ক'রে সারা বছর খেয়েপরেও কিছু উদ্বৃত্ত হয়। তাই যত দিন যেতে লাগল, ততই কেনারামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে লাগল।

এদিকে কেনারামের বাবাকে নিয়ে হ'লো মুশকিল! কয়েক দিনের জন্যে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে কয়েক মাস কেটে গেল, তবুও তিনি ফিরে এলেন না—এমন কি কোন খবর পর্য্যন্ত তাঁর পাওয়া গেল না। কেনারামের মামা গ্রামের যে লোক যখন তীর্থে যায়, সবাইকে বিশেষ ক'রে ব'লে দেন, তাঁর ভগ্নীপতি ফেলারামের খোঁজ করতে কিন্তু কেউ-ই সুবিধে করতে পারে না। ফিরে এসে বলে, ও-নামে কোন লোক নেই সেখানে! ভয়ে কেনারামের মামার মুখ শুকিয়ে গেল—বুঝি ভাগ্নেটার ভার চিরজীবনের মত তাঁর স্কন্ধে পড়লো!

এইভাবে দেখতে দেখতে ছ'বছর কেটে গেল।

এমন সময় গ্রামে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। পর পর দু'বছর অজন্মা—মাঠ ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে। কারো ঘরে ধানচাল নেই। যে যার হাল, গরু, বলদ বিক্রী ক'রে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। থালা-বাসন, গরু-ছাগল, এমন কি মানুষ পর্যন্ত জলের দামে বিক্রী হ'তে লাগল। স্ত্রী-পুত্রও বাদ গেল না। লোকে তা-ও বিক্রী করতে লাগল পেটের দায়ে।

কেনারামের মামা বহুদিন অনাহারে থেকেও নিজেকে সামলাতে পারলেন না! শেষে একদিন এক ডাকাতের কাছে কেনারামকে বিক্রী ক'রে দিয়ে কিছু চাল সংগ্রহ করলেন। আবার বহুদিন পরে তাঁদের পেটে দু'টি ভাত পড়লো।

তারপর কোথায় রইল কেনারাম আর কোথায় তার মামা?

ডাকাতরা তাকে নিয়ে চলে গেল কোন অজানা দেশে। বন-জঙ্গল ও পাহাড়-ঘেরা এক অন্ধকার স্থান—তারই মধ্যে তারা কেনারামকে নিয়ে গিয়ে রাখলে এবং লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতে লাগল।

এমনি ক'রে আরো দশ বছর কেটে যাবার পর কেনারাম রীতিমত ডাকাত হ'য়ে উঠলো। ব্রাহ্মণের ছেলে তার সহজাত দয়ামায়া সব ভুলে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে থেকে থেকে কেনারাম নির্মম নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠলো।

ষোল বছরের যুবক সে। মনে তার অগাধ সাহস, দেহে অপরিমিত ক্ষমতা! লোককে মেরেধরে, ছিনিয়ে সে জিনিসপত্তর লুঠ ক'রে আনে। হাসিমুখে মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। কেনারামের নামে লোকে ভয়ে শিউরে ওঠে।

তারা আট-দশজন মিলে বনের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে। পথিক দেখলেই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং তার যা থাকে ছিনিয়ে নেয়। এই হলো তাদের পেশা।

এইভাবে যত দিন যেতে লাগল, কেনারাম তত ভীষণ হ'য়ে উঠতে লাগল। সে হ'লো দলের সর্দার! তার অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো সবাই। কেনারামের নাম শুন্‌লে আতঙ্কে লোকের বুক টিপ্‌

ঢিপ্ করে।

দেশ-বিদেশে যেতে হ'লে লোকে কেঁদে অস্থির হয়। কোন্ পথে যে ডাকাত কেনারাম তাদের আক্রমণ করবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সন্ধ্যা হ'লে আর কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় না।

এদিকে হ'লো কি, কেনারামের বাবা ফেলারাম তীর্থে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে সাধু হ'য়ে গেলেন। সর্বদা ধর্মকথা, ধর্ম চিন্তা ও পবিত্র জীবন-যাপন কর্তে কর্তে তিনিও হ'য়ে উঠলেন অতি ধার্মিক পুরুষ। লোকে তাঁর নাম দিল দ্বিজবংশী। ঠাকুর-দেবতার নামগান এমন প্রাণ ঢেলে তিনি করতেন যে, যে শুনতো তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। অতি-বড় নিষ্ঠুর যে, তারও প্রাণ গলে যেতো। এমন ভাব, এমন দরদ দিয়ে তিনি নাম-সংকীর্তন করতেন যে, দূর-দূরান্তর থেকে লোকে আসতো তাঁর মধুর কণ্ঠে শ্রীভগবানের সেই নাম শুনতে। এই ভাবে বহু ভক্তশিষ্য তাঁর জুটে গেল এবং দেখতে দেখতে দ্বিজবংশীর নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে।

দলবল নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন গাইতে গাইতে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়।

এইভাবে একদিন দ্বিজবংশী একটা বন পেরিয়ে দূর গাঁয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরী নেই। সঙ্গে ভক্তবৃন্দ খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে চলেছেন—মাঝখানে তিনি মধুর কণ্ঠে কীর্তন গাইছেন এমন সময় রে-রে-রে-রে করতে করতে তাঁদের এসে ঘিরে দাঁড়াল দস্যু কেনারাম তার দলবল নিয়ে। সকলের হাতে ধারালো খাঁড়া, লাঠি-সড়কী, আরো কত রকমের অস্ত্র। কেনারাম গম্ভীরকণ্ঠে বললে, "কি আছে শিগগির দে—নয় ত এখুনি এই খাঁড়া দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেলবো।"

ঠাকুর বংশী বললেন, "বাবা, আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদের নাম কীর্তন ক'রে ভিক্ষা করি। তোমাদের কি দেবো—আমাদের কাছে তো কিছু নেই।"

এই কথা শুনে কেনারাম জ্বলে উঠলো। খাঁড়া মাথার উপর তুলে

ধরে বললে, "আর এক মুহূর্ত দেরী করলে কেটে ফেলবো"

ব্রাহ্মণ বললেন, "ব্রহ্মহত্যা ক'রে কেন মিছিমিছি অনন্ত নরক ভোগের পাপ করবে। তোমার প্রয়োজন টাকাকড়িতে, আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই, তখন মানুষকে হত্যা ক'রে কি ফল হবে বলো।"

কেনারাম হেসে বললে, "সদুপদেশ দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না। পাপের ভয় আমার নেই! হাজার হাজার মানুষ এই হাতে আমি হত্যা করেছি। কত মা পায়ে ধরে সন্তানের জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, কত নারী তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, তবুও কেউ আমার প্রতিজ্ঞা একবিন্দু টলাতে পারেনি। দস্যু কেনারাম অত সহজে ভোলে না, বুঝেছ ঠাকুর?"

কেনারামের নাম শুনে শিষ্যদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো! তারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে সভয়ে তাকাল কিন্তু ঠাকুর বংশী এতটুকু ভয় পেলেন না। শান্ত সংযতভাবে তিনি তখনো তাকে হিতো পদেশ দিতে লাগলেন। বললেন, "আমাকে মেরে তোমার কি লাভ হবে! বরং তোমার পাপের বোঝা তাতে আরো বাড়বে। আজ যে টাকাকড়ির লোভে তুমি এই নরহত্যা করছো, কাল যখন মৃত্যু এসে তোমার শিয়রে দাঁড়াবে তখন কি এই টাকাকড়ির কোন-কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? কোথায় থাক্‌বে তখন তোমার ধনদৌলত, কে ভোগ করবে? তবে কার জন্যে এই পাপকার্য করছো। একবার ভেবে দেখো ভালো ক'রে—তুমিও মানুষ, তোমারও মানুষের মত প্রাণ আছে। ইচ্ছা করলেই তুমি মানুষকে প্রাণ দান করতে পারো—তাদের ভালো করতে পারো।"

তখন কেনারাম বল্‌লে, "খুব তো বক্তৃতা দিলে। একবার তোমার নামটা কি বলো তো ঠাকুর!"

ঠাকুর বল্‌লেন, "দ্বিজবংশী।"

এই নাম শুনেই কেনারামের বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি সেই দ্বিজবংশী, যার নামগান শুনে পাষাণ

ও গলে জল হ'য়ে যায় ?"

ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তোমার মত মানুষের প্রাণ গলাতে পারলুম না, এই বড় দুঃখ।"

বাপ ও ছেলে—কেউ কাউকে চেনে না। বহু বছর আগে হ'য়েছে তাদের বিচ্ছেদ। আজ কালের গতিতে তাই একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত আর একজন সাধু। একজন মানুষের প্রাণ সংহার করে, আর একজন তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করে।

কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক দেরী হ'য়ে গেল দেখে তখন কেনারাম সঙ্গীদের ইসারা কর্‌লে। তারা তৎক্ষণাৎ খাঁড়া উঁচু ক'রে তাদের গর্দানের উপর ধর্‌লো।

ঠাকুর বংশী তখন কেনারামকে বল্‌লেন, "যখন মরতেই হবে তখন আমায় একবার ঠাকুরের নামকীর্তন করে নিতে দাও।"

সে বললে, "আচ্ছা একটু সময় দেওয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেরে নাও।"

খোল-করতাল বাজিয়ে ঠাকুর তখন দেবী মনসার বন্দনা গাইতে শুরু করলেন।

কিন্তু গান শুনতে শুনতে কেনারাম এমনিভাবে বিভোর হ'য়ে গেল যে, তার দুই চোখ দিয়ে অজস্রধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মনে হ'লো বুঝি কোন দেবতা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন গান গাইবার জন্যে। মশাল জ্বালিয়ে তখন তারা সকলে ঘিরে বস্‌লো ঠাকুরকে এবং হুকুম দিলে অনেকক্ষণ ধরে গান চালাবার জন্যে। তখন ঠাকুর বংশী আগাগোড়া 'মনসা-মঙ্গলের পালা' ধরলেন।

গান শুনতে শুনতে সারারাত কেটে গেল। 'বেহুলার ভাসান' যখন শেষ হয়ে গেল, তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে অরণ্যের বুকে। হাতের খাঁড়াখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে কেনারাম দ্বিজবংশীর চরণে লুটিয়ে পড়লো এবং বললে, "তুমি আজ থেকে আমার গুরু। এমন গান আমি জীবনে কখনও শুনিনি। আমার মত কঠিন হৃদয়কেও তুমি আজ গলিয়ে দিলে। তুমি ভগবান। আমার

যা-কিছু আছে আজ থেকে সব তোমার।"

এই বলে সে বনের মধ্যে থেকে সাত ঘড়া মোহর এনে তাঁর সামনে রাখলে।



প্রভু রাগ করবেন না। আমি অজ্ঞান—কিছু জানি না, তাই এ কাজ করেছি।

দ্বিজবংশী বল্লেন, "আমি যে ধন পেয়েছি, তোমার এই ধনরত্ন তার কাছে তুচ্ছ। তা'ছাড়া তোমার এই পাপের উপার্জন ছুঁলে আমার পাপ হবে। এ আমি চাই না। আমি গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবো—এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ!"

কেনারাম তখন তাঁর পায়ে ধরে বল্লে, "প্রভু, রাগ করবেন না। আমি অজ্ঞান—কিছু জানি না, তাই এ কাজ করেছি। ছেলেবেলা থেকে কেউ কোনদিন আমায় ভাল শিক্ষা দেয়নি, ভাল কথা বলেনি।

তাই এই পাপকার্যই ভালো ব'লে মনে করতুম। আজ আপনার কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে।"

এই ব'লে একে একে সে তার সারাজীবনের উপার্জন সাত ঘড়া মোহর নদীর জলে ঢেলে ফেলে দিলে।

তখন ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, "আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য।"

তারপর তাঁদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে কেনারাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে দস্যু কেনারাম ডাকাতি ছেড়ে ধরলে ভিক্ষাবৃত্তি। যে কেনারামের নাম শুনে একদিন লোক আতঙ্কে শিউরে উঠতো, সেই কেনারামের গান শুনে এখন লোকে চোখের জলে ভেসে যায়।

———

রূপবতী রাজকন্যা

এক রাজা—তাঁর নাম রাজচন্দ্র। তিনি রাজত্ব করতেন রামপুর শহরে। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে মস্ত বড় এই রাজ্য। হাতী, ঘোড়া, দাসদাসী, অট্টালিকা, ধন, ঐশ্বর্য তাঁর প্রচুর—অভাব ছিল না কিছুরই।

একদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হ'য়ে, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল—বহুদিন নবাবের কোন খবর পাওয়া যায়নি, অবিলম্বে তাঁর নিজের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

এই নবাবের অধীনেই ছিল এই রকম আরো অনেক ছোট-বড় রাজ্য। সবাই খাজনা দিত নবাবকে, তিনি ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। কাজেই সেখানকার রাজারা মাঝে মাঝে নবাবের কাছে গিয়ে সশরীরে হাজির হ'তেন এবং নানাভাবে তাঁকে পরিতুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন।

নবাব-বাদশার মেজাজ! এই একরকম আছে, পরক্ষণেই হয়তো গেল বদলে। কখন কার প্রতি বিরূপ হন, বলা যায় না। তাই সময়ে অসময়ে যে যখন পারতো ছুটে গিয়ে হাজির হ'তো নবাবসমীপে।

কথাটা মনে পড়তেই তাই রাজা রাজচন্দ্র অবিলম্বে রাজজ্যোতিষকে ডেকে পাঠালেন এবং দিনক্ষণ কবে ভাল আছে গণনা ক'রে দেখতে আদেশ করলেন।

দিনস্থির হ'লো।

রাজা রাজচন্দ্র তাঁর রাজ্যের যা-কিছু ভাল ভাল জিনিষ সব সংগ্রহ করলেন নবাবকে ভেট দেবার জন্যে। তারপর সঙ্গে নিলেন এক হাজার মোহর—রাজস্ব-স্বরূপ।

ঘাটে বাঁধা ছিল এক বিরাট ময়ূরপঙ্খী—লোকলস্কর, সেনা-সামন্ত নিয়ে রাজা গিয়ে তাতে উঠলেন। একশত দাঁড় বাইতে বাইতে নৌকো চললো।

নবাবেও রাজধানী মুর্শিদাবাদ। বহু নদ-নদী পেরিয়ে প্রায় তিন

মাস পরে রাজা রাজচন্দ্র সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন।

নবাব নিজে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। হিন্দুরাজাদের জন্যে যে-সব প্রাসাদ প্রস্তুত ছিল, তারই মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে সুন্দর তাতে রাজা রাজচন্দ্রের থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তা-ছাড়া সেনা'-সামন্ত, লোকজন, দাঁড়িমাঝিদের জন্যে সুন্দর সুন্দর ছাউনি ফেল্‌লেন সেই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে।

তারপর নবাবের দাসদাসী, ব্রাহ্মণ-পাচকরা সব ছুটোছুটি কর্‌তে লাগল তাদের সেবাযত্নের জন্যে। নবাবোচিত আদর-যত্নের মধ্যে তাঁরা রইলেই নবাবের অতিথি হ'য়ে।

নবাবের সঙ্গে রাজা আজ ভোজ খান, কাল নৃত্যগীতের মজলিসে রাত কাটান, পরশু হাতীঘোড়া নিয়ে শিকারে যান, তার পরের দিন হয়তো দেশ-ভ্রমণে বাহির হন—এইভাবে তাঁর দিন কাট্‌তে লাগল। নবাব নিজে এই মনোযোগ দেওয়াতে রাজা রাজচন্দ্র অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠলেন এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে মনে মনে গর্ব অনুভব করলেন।

এদিকে এক মাস দু'মাস ক'রে এক বছর কেটে গেল। ক্রমে এক বছর থেকে প্রায় দু'বছর কেটে যাবার সময় হ'লো। রাজা নবাবী আদবকায়দা ও খাতির-যত্ন উপভোগ করতে করতে এমন উন্মত্ত হ'য়ে উঠলেন যে, নিজের রাজ্যের কথা, নিজের ঘর-বাড়ীর কথা একেবারে ভুলে বসে রইলেন।

রাণী দেখলেন মহা মুশকিল! রাজা তো রাজ্যে ফেরবার নাম করেন না। তাছাড়া ঘরে তাঁর বিবাহযোগ্যা মেয়ে—বিয়েরও তার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের লোকেরা ছিঃ ছিঃ করছে এতবড় মেয়ের বিয়ে হয়নি বলে। চৌদ্দ পূর্ণ হ'য়ে মেয়ে পনেরো বছরে পড়লো, কি হবে। এই ভাবতে ভাবতে শেষে রাণী একখানি চিঠিতে সবিস্তারে সব লিখে একজন লোক পাঠালেন রাজার কাছে।

চিঠি পেয়েই রাজার হুঁস হ'লো। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবকে গিয়ে বললেন, "কালই দেশে রওনা হবো।"

নবাব বললেন, "আর দিনকতক থেকে যাও।"

রাজা বললেন, "আর একদিনও থাকবার উপায় নেই। মেয়ে পনেরো বছরে পড়েছে, তার বিয়ের একটা ব্যবস্থা শীগগির করতে না পারলে লোকে নিন্দে করছে!"

নবাব বললেন, "তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করবো, কোন ভয় নেই। ধন ঐশ্বর্য তুমি যত চাও, আমার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে তোমায় দেবো। আরো রাজ্য দেবো, আরো দেশ দেবো—তুমি যা চাও তাই দেবো। তা'ছাড়া তোমার সম্মান কত বেড়ে যাবে—তুমি হবে আমার শ্বশুর। রাজ্যের সমস্ত নৃপতি তোমায় সেলাম করবে! এমন কি, আমিও সেলাম করবো। যাও, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ের জোগাড় করো; আমি কয়েক দিন পরেই রওনা হচ্ছি।"

নবাবের আদেশ অমান্য করবার শক্তি তখন বাংলাদেশে আর কারো ছিল না। তাই ভয়ে রাজা রাজচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল! মুসলমানের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে অসম্ভব। তাতে ধর্ম যাবে—জাত যাবে! কিন্তু নবাবের মুখের ওপর কি করে বলবেন; তাই শুষ্কমুখে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় করে তিনি ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

রাজার মুখ দেখে ভয়ে রাণীর বুক কেঁপে উঠলো। তিনি তখন রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? রাজা কোন কথা গোপন না করে রাণীকে সব খুলে বললেন।

এই কথা শুনে রাণী কাঁদতে লাগলেন। রাজা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বললেন, "তুমি চুপ করো রাণী। আমি ত নবাবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না, তবে কেন এত কাঁদছো?"

রাণী বললেন, "তুমি নবাবের সঙ্গে কি করে পারবে? আর নবাবও তো এসে পড়লো বলে, এর মধ্যেই বা কি করে মেয়ের বিয়ে হবে।" এই বলে তিনি আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

রাজা বললেন, "শোন রাণী, মুসলমানের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবো না। কাল সকালে উঠেই যার মুখ দেখবে প্রথমে, তারই

সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে! এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

রাণী তখন করলেন কি, বাড়ীতে এক ছোকরা চাকর ছিল; তার নাম মদন—তাকে চুপি চুপি ডেকে সব কথা বললেন। মদন চাকর



চিঠি পেয়েই রাজার হুঁস হলো।

হ'লেও সে জাতে ছিল ব্রাহ্মণ এবং দেখতে শুনতেও বেশ ভাল ছিল। তাই কাল ভোরে উঠে আগে রাজাকে তামাক দেবার কথা তিনি ব'লে দিলেন।

এদিকে রাণী ভোরে উঠেই ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবং রাজার নিদ্রাভঙ্গ হ'তেই মদন একেবারে তামাক এনে তাঁর সামনে হাজির হ'লো।

রাজা তখন কোথায় তার বাড়ীঘর জিজ্ঞাসা করলেন এবং কার ছেলে, বাপ-মার পরিচয় কি—সব জেনে মনে মনে খুশী হলেন। তারপর মদনকে বললেন, "তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো।"

রাজার হুকুম অমান্য করবার মত ক্ষমতা মদনের ছিল না; তাই সে নীরবে সম্মতি জানালে।

রাজকন্যার নাম রূপবতী। সে তখন সোনার খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

রাণী-মা গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গালেন এবং তার হাত ধরে রাজার কাছে এনে একেবারে মদনের হাতে সঁপে দিলেন।

বিয়ের কোন উৎসব, কোন আয়োজন হলো না। পুরোহিত মন্ত্র



রাণী-মা গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ঘুম ভাঙ্গালেন

পর্যন্ত পড়লো না, শুধু ধর্মকে সাক্ষী করে রাজা ও রাণী মদনের হাতে চুপি চুপি কন্যাকে সঁপে দিলেন। ভোরের দিকে অন্ধকারে তখনো

রাজপুরী আচ্ছন্ন। সবাই যে যার ঘরে নিদ্রামগ্ন! কেউ বিয়ের কথা জানতে পারলে না। রূপবতী সমস্ত দিন ঘরে বসে বসে কাঁদল। রাণী-মাও অনবরত চোখের জল গোপন করতে লাগলেন।

এদিকে সেইদিনই গভীর রাত্রে রাজা একজন মাঝিকে ডেকে অনেক ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন এবং তার নৌকোতে মেয়ে ও জামাইকে তুলে দিয়ে রাজ্য থেকে বিদায় করলেন।

মাঝি সারারাত ধরে নৌকো বাইতে লাগল। হাওয়ার জোর ছিল, তাই পাল তুলে দিলে। তীরবেগে ছুটলো নৌকো।

বহু গ্রাম, বহু নদ-নদী ছাড়িয়ে ভোরের সময় নৌকো এসে লাগল এক নিবিড় অরণ্যের কাছে। তার চার পাশে কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন নেই! শুধু বন্য জন্তু-জানোয়ারের বাস সেখানে। এই অজানা জায়গায় মাঝি তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাজকন্যা সেইখানে বসে বসে কাঁদতে লাগল। মদন অনেক বুঝিয়ে তাকে শান্ত করলে।

এদিকে ভোর হ'তে না হ'তেই দু'জন জেলে নদীতে মাছ ধরতে এসে তাদের দেখতে পেলে! এমন লক্ষ্মী-প্রতিমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে সুদর্শন একটি যুবককে দেখে তারা অবাক হ'য়ে গেল। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে কেমন ক'রে মানুষ এলো? এই কথা ভাবতে ভাবতে তারা একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল এবং তাদের পরিচয় জিগ্যেস করলে।

পরিচয় তারা কিছুই বললে না, শুধু তাদের কথা শুনে রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমাদের কেউ নেই।

তখন জেলেদের মনে ভারি দুঃখ হ'লো। তারা দুই ভাই কিন্তু কারো ছেলেপিলে ছিল না। তাই নিজেদের ডিঙ্গিতে তাদের তুলে নিয়ে বাড়ীতে চলে গেল। জেলেদের বৌয়েরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো। কি করে যে তাদের খাওয়াবে পরাবে তা ভেবেই পায় না! সেখানে তারা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের মত করে আদর-যত্নে প্রতিপালন করতে লাগল। মদন আর রাজকন্যা তাদের বড়-বৌকে

বলতো, বড়-মা আর ছোট-বৌকে বলতো, ছোট-মা।

এইভাবে কিছুকাল কাটবার পর একদিন মদন রাজকন্যাকে বললে, "বহুদিন আমি নিজের দেশে যাইনি এবং বাপ-মাকে দেখিনি, একবার তাঁদের দেখে আসি। দিন কয়েকের মধ্যেই আবার ফিরে আসবো!"

রাজকন্যা তাকে অনুমতি দিলে। মদন চলে গেল।

কিন্তু পনেরো দিনের স্থলে এক মাস এবং এক মাস থেকে ক্রমে দুমাস কেটে গেল। তখনো মদন ফিরে এলো না দেখে রাজকন্যার মনে ভয় হলো। সে রোজ পথের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাকে এবং জেলেদের বৌদের জিজ্ঞাসা করে, কেন তার এত দেরী হচ্ছে?

এমন সময় একদিন জেলেরা ভাত খেতে বসে গল্প করতে লাগল যে,রামপুরের রাজা রাজচন্দ্রের একমাত্র কন্যাকে কোন দস্যু রাজ্য থেকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে! যে তাকে ধরে দিতে পারবে তাকে রাজা প্রচুর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

এই কথা শুনেই রাজকন্যার বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। তবে কি মদনকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে রাজার কাছে। তৎক্ষণাৎ কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা তাদের পরিচয়ের সমস্ত কথা জেলেদের কাছে খুলে বললে।

জেলেরা ভারী রেগে গেল রাজার ওপর। কি অন্যায় তাঁর! নিজে হাতে করে যার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন, তাকেই আবার চোর বলে ধরবার জন্যে ঢেঁড়া দিলেন!

তারা স্থির করলে, সকলে মিলে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর অবিচারের কথা বলবে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে তারা নৌকো ছেড়ে দিলে। জেলেরা দুই ভাই—একজন হাল ধরে বসে রইল, আর একজন দাঁড় বাইতে লাগল। মাঝখানে রাজকন্যা আর জেলেদের দুই বৌ বসে রইল।

এইভাবে সমস্তদিন, সমস্তরাত নৌকো বেয়ে তারা সকালে গিয়ে পৌঁছল রামপুরে।

তখন রাজা রাজচন্দ্র পাত্রমিত্র ও সভাসদ পরিবৃত হ'য়ে সভায় বসেছিলেন।

জেলেরা একেবারে রাজকুমারীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে হাজির হ'লো। তারপর কেমন ক'রে রাজা রাজকুমারীর গোপনে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেমন ক'রে তাকে এক জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যাগ করেছিলেন, আবার কেমন ক'রে সেই জামাতাকে চোর ব'লে ধরবার আদেশ দিয়েছিলেন—একে একে সমস্ত সেই সভার লোকজনের সামনে বিবৃত করলে।

এসব কথা রাজ্যের আর কেউ জানতো না। কাজেই সবাই অবাক হ'য়ে রাজাকে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি ?

রাজার মন তখন কন্যার দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। তা'ছাড়া তিনি রাজা হয়ে মিথ্যা কথা কি করে বলবেন ? তাই তৎক্ষণাৎ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "জেলেরা যা বললে তার প্রতিটি কথা সত্য ! শুধু নবাবের হাত থেকে কন্যাকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এই কাজ করেছিলুম এবং নবাবকে খুশী করবার জন্যে চোরকে ধরে আনবার হুকুম দিয়েছিলুম।

তখন সকলে রাজাকে ধন্য ধন্য করলে এবং তখনি বন্দী মদনকে সেখানে এনে রাজা মুক্তি দিলেন।

তারপর খুব জাঁকজমক করে আবার রাজকুমারীর বিবাহের উৎসব সম্পন্ন হলো।

—শেষ—

অনুশীলনী

মহুয়া

যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

১। হুমড়ো সর্দার কে ছিল? তার পেশা কি ছিল? সে কি ভাবে মহুয়াকে যোগাড় করেছিল? সে কখন কিভাবে মহুয়ার জীবনকে বিড়ম্বিত করে তুলেছিল?

২। নদের চাঁদ কে ছিল? তার জীবন-কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। মহুয়া কে ছিল? তার বিড়ম্বিত জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

কাজলরেখা

যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

১। সাধু ধনেস্বর কে ছিল? মা-লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন? সে তার হারানো সম্পত্তি আবার ফিরে পেয়েছিল কিভাবে? তার মেয়ের নাম কি ছিল? মেয়েকে কেন সে বনে বিসর্জন দিয়ে এসেছিল?

২। ধনেশ্বরের মেয়ে কি ভাবে স্বামীলাভ করেছিল? 'কি নিষ্ঠুর! কি হৃদয়হীন এই বাপেরা!' এই কথা সে কেন বলেছিল? কাঁকনদাসী কে? কেন তার এই নাম হয়েছিল। সে কি ভাবে ধনেশ্বরের মেয়ের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল?

৩। রত্নেশ্বর কে? সে কিভাবে তার বোনের দুঃখ-বেদনা দূর করে জীবনকে সুখী করে তুলেছিল বর্ণনা কর।

ফুলকুমার

যে-কোন একটি প্রশ্নের উওর দাও :—

১। 'লক্ষ্মীর বরপুত্র' কাকে বলা হ'ত? তার মনে সুখ ছিল না কেন? সে কিভাবে তার কন্যা কাঞ্চনমালাকে লাভ করেছিল? কিভাবে কাঞ্চনমালার বিয়ে হয়েছিল? তার স্বামীর নাম 'ফুলকুমার' হ'ল কেন?

২। ফুলকুমারের সঙ্গে কিভাবে রাজা বিদ্যাধরের কন্যা কুণ্ডলতার বিয়ে হয়েছিল? কাঞ্চনমালা কিভাবে তার দাসী হয়েছিল উল্লেখ কর।

৩। কাঞ্চনমালার স্বামী কিভাবে চক্ষুষ্মান হয়েছিল? এর মূলে কার আত্মত্যাগ ছিল? তার মহত্ত্ব আলোচনা কর।

দস্যু কেনারাম

যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

১। কেনারাম কে ছিল? সে মামার বাড়িতে লালিত-পালিত হয়েছিল কেন? সে ডাকাত হয়েছিল কেন?

২। দ্বিজ ফেলারাম 'দ্বিজবংশী' হয়েছিল কিভাবে? তার চরিত্র-মাধুর্য বর্ণনা কর।

৩। দস্যু কেনারাম সাধু হ'ল কিভাবে উল্লেখ কর।

রূপবতী রাজকন্যা

যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

১। রামপুরের রাজার নাম কি? রামপুর শহরটি কোথায় অবস্থিত ছিল? দু-এক কথায় রাজ্যের ঐশ্বর্যের পরিচয় দাও।

২। রামচন্দ্র মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন কেন? নবাব তাঁকে কিভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন? সেখানে তিনি কতদিন ছিলেন? রানী রাজা রামচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন কেন?

৩। রাজা রামচন্দ্র কন্যা রূপবতীর সঙ্গে ভৃত্য মদনের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? তিনি নবাবকে খুশী করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন?